প্রকাশক—

শ্রীদীনেশচন্দ্র বর্ম্মণ

আর্য্য পাবলিশিং কোং

২৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

প্রকাশকের কথা

বাঙ্গলা সাহিত্যের এ অমূল্য রত্ন কয়টি পুরাতন সাময়িক পত্রাদির গর্ভে সমাধিস্থ ছিল। এ গুলি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয়। ভয়ে ভয়ে এক দিন পূজ্যপাদ শরৎচন্দ্রের নিকট আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করি এবং তিনিও সানন্দে তাহা দান করেন।

আজ সেগুলি বাঙ্গলার সুধী-সমাজের হাতে অর্পণ করিতে যাইয়া আনন্দও হইতেছে, ভয়ও হইতেছে। যোগ্যতর লোক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলে হয়ত এ রত্নগুলির মর্য্যাদা রক্ষা হইত, সঙ্গত হইত, শোভনও হইত। তাঁহারা যাহা পারিতেন আমি হয়ত যোগ্যতা ও সঙ্গতির অভাবে তাহা পারি নাই, তথাপি আমার আশা এই যে, শরৎচন্দ্রের লেখনী যে রচনা প্রসব করিয়াছে, তাহা নিজের গৌরবে নিজেই গৌরবান্বিত, নিজের প্রভায় নিজেই উজ্জল। যোগ্যতা থাকিলে প্রবন্ধগুলির বাহিরের সৌন্দর্য্য বাড়িতে পারিত বটে কিন্তু আমার অযোগ্যতায়ও বোধকরি ইহাদের ভিতরের সৌন্দর্য্য কমে নাই,—কমিতে পারেও না।

কিছু দিন আগে অপর দুইটি মূল্যবান রচনা এই সম্পূর্ণ সঙ্কলন-গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "তরুণের বিদ্রোহ" নামে প্রকাশ করিতে হইয়াছে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তা' করিয়াছিলাম, কেন করিয়াছিলাম তা' বলিবার দিন আজও আসে নাই, যদি কখনো সে দিন আসে বলিব,—এ ত্রুটি সংশোধনও সেদিনই হইবে। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠক সমাজের কাছে আজ শুধু মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সমস্ত প্রবন্ধ হয়ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—যদি কেহ দয়া করিয়া প্রকাশ-যোগ্য অপর কোন প্রবন্ধের সন্ধান দেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংযোগ করিয়া দিব। কতকগুলি অসমাপ্ত রচনা পরিত্যাগ করা উচিত মনে করিয়া তাহাই করিয়াছি। এ ছাড়াও কয়েকটি প্রবন্ধ অনিবার্য্য কারণে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কয়েকটি বক্তৃতা, যাহা সাময়িক পত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও সংযোগ করি নাই। কারণ, যাঁহারা অনুলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা শরৎচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ ভাষার সম্মোহিনী-শক্তি বজায় রাখিতে পারেন নাই। ভাব শরৎচন্দ্রের হইলেও ভাষা কৃত্রিম। ভাষার যাদুকর শরৎচন্দ্রের স্কন্ধে সে দুষ্কৃতির ভার চাপাইতে প্রবৃত্তি হইল না।

যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকটি ভুল রহিয়াই গিয়াছে। 'ছাপাখানার ভূত'এর দৌরাত্ম্য শারীরিক অসুস্থতা, সময়ের অভাব প্রভৃতি অজুহাত দেখাইয়া আমি তাহার দায়িত্ব এড়াইতে চাই না। সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমি নিজের অপারগতার জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। একটা মারাত্মক ভুলের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুন্সীগঞ্জে পঠিত অভিভাষণটি "সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহা অভিভাষণ হিসাবে পড়িয়াছিলেন, প্রবন্ধ হিসাবে নহে এবং ইহার কোন বিশেষ নাম দেওয়ারও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কোন মাসিক পত্রে উক্ত নামে অভিভাষণটি প্রকাশিত হওয়ায় অসাবধানতা বশতঃ এ ক্ষেত্রেও তাহাই ছাপা হইয়া গিয়াছে। এই লজ্জাকর ভুলের জন্য আমি পূজ্যপাদ শরৎচন্দ্র ও পাঠক সমাজের নিকট অপরাধী।

মোট যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল তাহার কয়েকটি সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলা দরকার—

পূজ্যপাদ কবি রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ_প্রত্যাগমনের পর ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় "শিক্ষার মিলন" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন! 'শিক্ষার বিরোধ' সে প্রবন্ধটির প্রতিবাদ। পরে 'শিক্ষার মিলন' সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিক্ষার বিরোধে' যে সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, তাহা উক্ত পুস্তিকায় সন্ধান করিলে পাঠক নিরাশ হইবেন। সকল কথার সামঞ্জস্য খুঁজিতে হইলে মূল প্রবন্ধটি পড়া দরকার।

স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর মির্জ্জাপুর পার্কে (বর্ত্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, তাহা শরৎচন্দ্রের রচনা। অভিনন্দন রচনায় প্রাণ ও নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও আর একটি বিশেষত্বের জন্য ইহা চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। পূর্ব্বে অভিনন্দন-পত্র রচনার যে সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার প্রভাব হইতে মুক্তত বটেই উপরন্তু বর্ত্তমান যুগের অভিনন্দন-পত্র রচনা-রীতির উপর ইহারই প্রভাব লক্ষিত হয়।

"আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ," "সাহিত্য ও নীতি," "সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি" এবং প্রসঙ্গ ক্রমে ৫৪তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে, "বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে, প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠিত অভিভাষণে" ও অন্যান্য প্রবন্ধে একই বিষয়ের অবতারণা দেখা যায়। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনকয়েক শুচিবায়ুগ্রস্ত সমালোচকের কৃপায় আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে বিশেষভাবে শরৎ-সাহিত্যের প্রতিই সকলে "দুই হাত পুরিয়া বিদ্বেষের অবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতে থাকেন।" উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি তাহার প্রতিবাদে সে সময়েরই রচনা। সব ক'টি প্রবন্ধ ও অভিভাষণেই তিনি সাধারণতঃ তাঁহার

সাহিত্য রচনার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, বোধকরি এ জন্যই তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পড়িবার সময় কাল ও পরিস্থিতি বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

"সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি" প্রবন্ধটি পড়িবার পূর্ব্বে ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য ধর্ম্ম" ও তাহার প্রতিবাদে এবং ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্য ধর্ম্মের সীমানা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটী পড়িলে ভাল হয়।

পরিশেষে আর একটি কথা না বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার শক্তি অল্প, যোগ্যতা আরও অল্প। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিতিাক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থালয় ও চৈতন্য লাইব্রেরীর সহায়তা না পাইলে সমস্ত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আমাদ্বারা কতদূর সম্ভব হইত ঠিক বলিতে পারি না। বিশেষ ভাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছায় এবং অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সকল কাজে আন্তরিক ভাবে সাহায্য না করিলে আমাদ্বারা এ কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। শরৎচন্দ্রের চল্লিশ বছর বয়সের দুষ্প্রাপ্য ছবিখানিও তাঁহারই নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। 'বিচিত্রা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার সুদৃশ্য ব্লকটি ছাপিতে দিয়া বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। মৌখিক ধন্যবাদ দিয়া আমি ইঁহাদের দানের অমর্য্যাদা করিতে চাই না। পুস্তকখানার সহিত চিরকাল ইঁহাদের সহৃদয়তার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

নিবেদক—

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯। শ্রীদীনেশচন্দ্র বর্ম্মণ।

স্বদেশ

হাবড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটার আমি ছিলাম সভাপতি। আমিও আমার সহকারী বা সহকর্ম্মী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই পদত্যাগ করে'ছেন। এই কথাটা জানাবার জন্যেই আজকের এই সভার আয়োজন। নইলে সাড়ম্বরে বক্তৃতা শোনাবার জন্যে আপনাদের আহ্বান করে' আনিনি। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এই ক্ষুদ্র শাখার যে কর্ম্মভার আমার প্রতি ন্যস্ত ছিল তা' থেকে বিদায় নেবার কালে আপনাদের কাছেই মুক্তকণ্ঠে তা'র হেতু প্রকাশ করাই এ সভার উদ্দেশ্য। একটা কথা উঠেছিল, চুপি চুপি সরে' গেলেই ত হতো; এই লজ্জাকর ঘটনা এমন ঘটা করে' জানাবার কি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে হয় প্রয়োজন ছিল, মনে হয় নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে' গেলে চক্ষুলজ্জাটা বাঁচত, কিন্তু তাতে সত্যকার লজ্জা চতুর্গুণ হ'য়ে উঠত। এর পরে এ জেলায় কংগ্রেস কমিটী থাকবে কি থাকবে না, আমি জানিনে। থাকতে পারে, না থাকাও বিচিত্র নয়; কিন্তু সে যাই হোক্ ভেতরে যার ক্ষত, বাইরে তাকে অক্ষত দেখানোর পাপ আমি করতে চাইনে। এ একটা Policy হতে পারে, কিন্তু ভাল Policy বলে কোন মতেই ভাব্‌তে পারি নে।

আমি কর্ম্মী নই, এ গুরুভারের যোগ্য আমি ছিলাম না। অক্ষমতার ক্ষোভ আমার মনের মধ্যে আছেই, কিন্তু যে ভার একদিন

গ্রহণ করেছিলাম, আজ তাকে অকারণে বা নিছক স্বার্থের দায়ে ত্যাগ করে' যাচ্ছি, যাবার সময় এ কলঙ্কও আমার প্রাপ্য নয়। আমার এই কথাটাই আজ আপনাদের একটু ধৈর্য্য ধরে' শুনতে হ'বে।

আমার মনের মধ্যে হয়ত রূঢ় কথা কোথাও একটু থেকে যেতে পারে, হয়ত আমার অভিযোগের মধ্যে অপ্রিয় স্বরও আপনাদের কানে বাজাবে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যা' সত্য বলে' জেনেছি বা বুঝেছি, আপনাদের গোচর না করে' আজ আমার ছুটি হ'তেই পারে না। কারণ, সত্য গোপন করা আত্মবঞ্চনারই সমান। এক আশঙ্কা প্রতিপক্ষের উপহাস ও বিদ্রূপ। কিন্তু নিজের কর্ম্মফলে তাই যদি অর্জ্জন করে' থাকি, আমি ছাড়া সে আর কে নেবে? আর তা' যদি না হ'য়ে থাকে, বিদ্রূপের হেতু যদি সত্যই না ঘটে' থাকে ত ভয় কিসের? যথার্থ সম্মানের বস্তুকে যে মূঢ় অযথা ব্যঙ্গ করে, সমস্ত লজ্জা-ত তারই। অতএব, এ সকল মিথ্যা দুশ্চিন্তা আমার নেই। আমার একমাত্র চিন্তা অকপটে আপনাদের কাছে সমস্ত ব্যক্ত করা। কারণ, প্রতীকারের ইচ্ছা ও শক্তি আপনাদেরই হাতে। এই শেষ মুহূর্ত্তেও যদি একে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চান, সে শুধু আপনারাই পারেন।

পাঞ্জাব অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পূর্ব্বে একদিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হ'য়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশ-জোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয় জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিকে প্রচার করে' বলেছিলাম, স্বরাজ চাই-ই চাই। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোন দিন প্রতিবিধান হ'তে পারবে না। কথাটা যে মূলতঃ

সত্য, এ বোধকরি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতায় মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসন-ভার ভারতবর্ষীয়দের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে কেউ তাদের বঞ্চিত করে' রাখে, সেই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একটা কথা আছে, যা'কে স্বীকার না করে' পথ নেই, —সে হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য।

Right এবং Duty এই দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াতে পারে না, এতো অবিসম্বাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্বনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্ত্তব্যের দায় নিয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাব এত বড় অন্যায়, অসঙ্গত দাবী, —এত বড় পাগলামী আর ত কিছু হ'তেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবল মাত্র ভারতবর্ষীয় হ'য়ে জন্মেছি বলে'ই ভারতের স্বাধীনতার অধিকার উচ্চকণ্ঠে দাবী করাও কোন মতেই সত্য হ'তে পারে না! এবং এ প্রার্থনা ইংরাজ কেন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বোধ করি মুঞ্জুর করতে পারেন না। এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চিরনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আজ আমাদের এসেছে। একে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ কখন পায়নি, পায়না এবং আমার বিশ্বাস, কোনদিন কখনো কেউ পেতেও পারে না। কর্ত্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান। কাজ কোরব না, মূল্য দেবো না অথচ পাবো, প্রার্থনার এই অদ্ভুত

ধারাই যদি আমরা গ্রহণ করে' থাকি, তা হ'লে নিশ্চয়ই বল্‌ছি আমি, কেবল মাত্র সমস্বরে ও প্রবল কণ্ঠে বন্দেমাতরম্‌ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বা'র হ'বে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তা'তে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে' বসবে না।

একটুখানি অবিনয়ের অপবাদ নিয়েও বল্‌তে হচ্ছে, বুড়ো হ'লেও চিরদিনের অভ্যাসে এ চোখের দৃষ্টি আমার আজও একেবারে ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়নি। যা' যা' দেখ্‌ছি, (অন্ততঃ এই হাবড়া জেলায় যা' দেখেছি) তা' নিছক এই ভিক্ষার চাওয়া, দাম না দিয়ে চাওয়া, ফাঁকি দিয়ে চাওয়া। মানুষের কাজ-কর্ম্ম, লোক-লৌকিকতা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, সর্ব্বপ্রকারের সুখ সুবিধের কোথাও যেন কোন ত্রুটি না ঘটে, পান থেকে একবিন্দু চূণ পর্য্যন্ত যেন না খস্‌তে পায়,—তার পরে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ করে' দিয়ে আসা পর্য্যন্ত বল, যা' হয় তা' হোক্‌, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু ইংরাজের আছে। শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের এই হাস্যাস্পদ চাওয়াটাকে সে যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে ভারতবাসী স্বরাজ চায় না,—সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা বলে? যে ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করে'ছে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে যে এক নিমেষ দ্বিধা করে না, যে স্বাধীনতার স্বরূপ জানে, এবং পরাধীনতার লোহার শিকল মজবুত করে' তৈরী করবার কৌশল যার চেয়ে বেশী কেউ জানে না,—তাকে কি কেবল ফাঁকি দিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে, গলায় এবং কলমে গালিগালাজ করে', তার ত্রুটি ও বিচ্যুতির অজস্র প্রমাণ ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে', তাকে লজ্জা দিয়েই এত বড় বস্তু পাওয়া যা'বে?

এ প্রশ্ন ত সকল তর্কের অতীত করে' প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, এই লজ্জাকর বাক্যের সাধনায় কেবল লজ্জাই বেড়ে উঠবে, সিদ্ধিলাভ কদাচ ঘটবে না।

আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উদ্যম নেই। জড়ের মত নিশ্চল হ'য়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন আমার স্বর ফোটে না, পরের মুখেও তত্ত্বকথা শোন্‌বার ধৈর্য্য আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, ত সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপ-শিখার, দীপের নয়; নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী দাওয়া উত্থাপনের আগে একথা ভুলে' গেলে কেবল ইংরাজ নয়, পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।

মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁর কারাবাসের প্রথমদিনে মারামারি কাটাকাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হ'য়ে রইল। দেশের লোকে সগর্ব্বে বল্‌লে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল। Anglo-Indian কাগজওয়ালারা হেসে জবাব দিলে, এ শুধু নিছক Indifference। আমার কিন্তু এ বিবাদে কোন পক্ষকেই প্রতিবাদ করতে মন সরে না। মনে হয়, যদি হ'য়েও থাকে ত দেশের লোকের এতে গর্ব্বের বস্তু কি আছে? Organised violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ Violence? সে ত কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্র ব্যক্তি একত্র হ'য়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কা'রও ব্যবসা নয়, ইচ্ছাও নয়, অথচ এ কথাও ত কেউ জোর করে' বলতে পারিনে আমাদের বাড়ী ফেরবার পথটুকুর মাঝেই, হঠাৎ কিছু একটা বাধিয়ে না দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে একটা

মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও তো অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই, এবং আমিও একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চাইনে, কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে' বেড়ানোরও হেতু নাই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে' সান্ত্বনা লাভ করতে যাওয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা। আর Indifference? এ কথায় যদি কেউ এই ইঙ্গিত করে' থাকে যে, মহাত্মার কারারোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজেনি, ত তার বড় মিছে কথা আর হ'তেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হ'য়েই বেজেছে; কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতীকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসে না।

প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত্ত মন যেমন উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে, অথচ, যা' অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে হাত নেই, এই বলে' মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-তামাসা, কাজ-কর্ম্ম যথারীতি পূর্ব্বের মতই চল্‌তে থাকে, মহাত্মার সম্বন্ধেও দেশের লোকের মনোভাব প্রায় তেম্‌নি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ্‌ সাহেবের উপর। কেউ বল্‌লে তার প্রশংসা বাক্য কেবল ভণ্ডামি, কেউ বল্‌লে তার দু'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বল্‌লে বড় জোর তিন বছর, কেউ বল্‌লে না চার বছর, কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হ'ল তখন আর উপায় কি? এখন গবর্ণমেণ্ট যদি দয়া করে' কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল হোক্ না জেল ছ'বছর, হোক্ না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করা ত দেশের লোকেরই হাতে। যে দিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশী কেউ তাঁকে জেলে ধরে' রাখতে পারবে না, তা সে গবর্ণমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হউন। কিন্তু সে আশা তাঁর একলারই ছিল, দেশের লোকের সে ভরসা করবার সাহস

হলো না। তাদের অর্থোপার্জ্জন থেকে সুরু করে' আহার নিদ্রা অব্যাহত চল্‌তে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হলো না, শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্ম্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পঁচতে লাগ্‌লেন। প্রতিবিধান করবে কি, এতবড় হীনতায় লজ্জা বোধ করবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন এদের চলে' গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে Non violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধীজীর Movement কি Practical? তাইত আমরা···। কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে দেবে কোন Movementই কিছু নয়, যে Move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে Co-operation, Non-co-operation, Violence, Non-violence সবই সমান, সবই সমান ফলপ্রসূ।

Non-co-operation বস্তুটা ভিক্ষে চাওয়া নয়, ও একটা কাজ, সুতরাং একথা কিছুতেই সত্য নয় যে, Non-co-operation পন্থা এ দেশে অচল,—মুক্তির পথ সে দিকে যায়নি। অন্ততঃ, এখনো একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক্, যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে। এরা কা'রা জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশ-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করে'ছিল, উকীল তার ওকালতী ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে, চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে,—এরা তাঁদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আপনার কল্যাণে, আমার কল্যাণে, সমস্ত নরনারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাদের কি দাঁড় করিয়েছে

জানেন ? আজ তারা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত, পীড়িত, ভিক্ষুকের দল। তাদের জীর্ণ মলিন বাস; তারা গৃহহীন, তারা মুষ্টিভিক্ষায় জীবন যাপন করে, যৎসামান্য তেল নুনের পয়সার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে বাধ্য হয়। অথচ স্বেচ্ছায় সে সমস্ত ত্যাগ করে' এসেছে! যতটুকুতে তার প্রয়োজন, সে টুকু সমস্ত দেশের কাছে কতই না অকিঞ্চিৎকর! এইটুকু সে সসম্মানে সংগ্রহ করতে পারেনা। অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে' বেড়াচ্ছে। আশার প্রদীপ—তা সে যতই ক্ষীণ হোক্, আজও এদেরই হাতে। এদের নির্য্যাতনের কাহিনী সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়, কিন্তু সে কতটুকু—যে অব্যক্ত লাঞ্ছনা ও অপমান এদের দেশের লোকের কাছে সহ্য করতে হয়! মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক্ বা যাক্ এদের অশ্রদ্ধেয় করে' আনবার, দীন হীন ব্যর্থ করে' তোলবার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের লোককে একদিন করতেই হ'বে, যদি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও সত্যকার বিধি বিধান কোথাও কোনখানে থাকে। হাবড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অন্ততঃ এ জেলার লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য। কেউ কিছু কোরব না, কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার বাঁধা ধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রার এক তিল বাহিরে যেতে পারব না.—আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ীর উপর বাড়ী, গাড়ীর উপর গাড়ী, আমার দোতালার উপর তেতালা এবং তার উপর চৌতালা অবারিত এবং অব্যাহত

উঠ্‌তে থাক্—কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে, খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও কখনো হয় না। আসল কথা এরা বিশ্বাস কর্‌তেই পারে না, স্বরাজ নাকি আবার কখনও হ'তে পারে। তার জন্য আবার নাকি চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হ'বে তাঁতে, কি হ'বে চরকায়, কি হ'বে দেশাত্মবোধের চর্চ্চায়? নিবানো দীপ-শিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, একমাত্র হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হ'বে আর কিছুতে!

একটা নমুনা দিই :—

সেদিন নারী কর্ম্মমন্দির থেকে জন দুই মহিলা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে নিয়ে দুর্য্যোগের মধ্যেই আম্‌তা অঞ্চলে বেড়িয়ে পড়েছিলাম, ভাবলাম ঋষিতুল্য ও সর্ব্বদেশপূজ্য ব্যক্তিটাকে সঙ্গে নেওয়ায় এ যাত্রা আমার সুযাত্রা হ'বে। হ'য়েও ছিল। বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার ও তাঁর নিজের প্রবল জয়ধ্বনির কোন অভাব ঘটেনি এবং ওই রোগা মানুষটিকে স্থানীয় রায় বাহাদুরের ভাঙ্গা তাঞ্জামের মধ্যে সবলে প্রবেশ করানোরও আন্তরিক ও একান্ত উদ্যম হ'য়েছিল। কিন্তু তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ—আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হ'ল টাকা পঞ্চাশ। ঝড়ে, জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে' বেড়া'তে পুলিশেরও খরচা হ'য়ে গেল বোধ হয় এম্‌নি একটা কিছু। বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, উকীল মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস, অতএব স্থানীয় তাঁত ও চরকার উন্নতিকল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হ'ল তিন টাকা পাঁচ আনা। তারপর আচার্য্য দেব বহু পরিশ্রমে

আবিষ্কার করলেন জন দুই উকীল বিলাতী কাপড় কেনেন্ না, এবং একজন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'য়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন, ভবিষ্যতে তিনি আর কিন্‌বেন না। ফেরবার পথে প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্ল হ'য়ে আমার কাণে কাণে বল্‌লেন, হাঁ, জেলাটা উন্নতিশীল বটে! আর একটু লেগে থাকুন, Civil disobedience বোধ হয় আপনারাই declare কর্‌তে পারবেন।

আর জনসাধারণ? সে তো সর্ব্বথা ভদ্রলোকেরই অনুগমন করে।

এ চিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি; কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য্য করে' নেবে? কারও কোন কথা, কোন ত্যাগ, কোন কর্ত্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করে'ছে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার কর্‌তে চায় না, যারা Governmentএর কাছেও পরাভব স্বীকার করেনি, তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে' যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না?

এই প্রসঙ্গে আমার বাঙ্গলা দেশের Provincial Congress Committeeর কথা উল্লেখ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর লজ্জা বাড়িয়ে তুল্‌তে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

আমার এক আশা, সংসারের সমস্ত শক্তিই তরঙ্গ গতিতে অগ্রসর হয়। তাই তার উত্থান পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নীচে পড়েছে, কাল সেই আবার উপরে উঠ্‌বে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হ'বে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল, তাই তার শিখরদেশ একস্থানে উঁচু হ'য়েই থাকে, তাকে নাম্‌তে হয় না। কিন্তু বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের সে

ব্যবস্থা নয়—তার উঠা পড়া আছে ; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। তখনি সে কেবল উঁচু হ'য়ে থাকতে চায় যখন জমে বরফ হ'য়ে উঠে। তেম্‌নি আমাদের এও যদি একটা Movement, পরাধীন দেশের একটা অভিনব গতিবেগ, তা হ'লে উঠা-নামার আইন একেও মেনে নিতে হ'বে, নইলে চল্‌তেই পারবে না।

কিন্তু সঙ্গে যারা চল্‌বে তাদের রসদ যোগান চাই। রসদ না পেয়েও এতদিন কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখন আমরা ক্ষুধিত, ক্লান্ত, পীড়িত,—আমাদের বিদায় দিয়ে নূতন যাত্রী আপনারা মনোনীত করে নিন।*

* ১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাবড়া জিলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগ কালে পঠিত অভিভাষণ।

স্বরাজ সাধনায় নারী

শাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকেই হয়ত ঐ তিনটির পর্য্যায়েই ফেলা যায়, কিন্তু আমার আলোচনা আজ সে নয়। বর্ত্তমান কালে যে তিন প্রকার ভয়ানক দুঃখের মাঝখান দিয়ে জন্মভূমি আমাদের গড়িয়ে চলে'ছে, সেও তিন প্রকার সত্য, কিন্তু সে হচ্ছে রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক। রাজনীতি আমরা সবাই বুঝিনে, কিন্তু এ কথা বোধ করি অনায়াসেই বুঝতে পারি এই তিনটিই একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একটা কথা উঠেছে, একা রাজনীতির মধ্যেই আমাদের সকল কষ্টের, সকল দুঃখের অবসান। হয়ত এ কথা সত্য, হয়ত নয়, হয়ত সত্যে মিথ্যায় জড়ানো, কিন্তু এ কথাও কিছুতেই সত্য নয় যে, মানুষের কোন দিক দিয়েই দুঃখ দূর করার সত্যকার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে আছেন তাঁরা সর্ব্বথা, সর্ব্বকালে আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরা, সকলেই যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে নাও পাই, যে দাগগুলো কেবল স্থুল দৃষ্টিতেই দেখতে পাওয়া যায়—আমাদের আথিক এবং সামাজিক স্পষ্ট দুঃখগুলো—কেবল এইগুলিই যদি প্রতীকারের চেষ্টা করি, বোধ হয় মহাপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের স্কন্ধ থেকে একটা মস্ত গুরুভারই সরিয়ে দিতে পারি।

স্বরাজ সাধনায় নারী

তোমাদের দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্কালে, তোমাদের এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়, এই শেষের দিকের অসহ্য বেদনার গোটা কয়েক কথা তোমাদের মনে করে' দেবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমিও সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে'ছি। এই সুযোগ এবং সম্মানের জন্য তোমাদের এবং গুরুস্থানীয়দের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।

এই সভায় আমার ডাক পড়েছে দু'টো কারণে। একেত মৈত্র মশাই আমার বয়সের সম্মান করে'ছেন, দ্বিতীয়তঃ একটা জনরব আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে আমি অনেক দিন ধরে' অনেক ঘুরে'ছি। ছোট বড়, উঁচু নীচু, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে, অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে' রেখে'ছি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু কথাটা ঠিক সত্য না হ'লেও একেবারে মিথ্যাও বলা চলেনা। দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করে' আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে' গিয়ে তাদের মধ্যে পড়ে'ছি, এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হ'য়ে আছি। তাদের সেই সব অসহ্য, অব্যক্ত, দুঃখ ও দৈন্য ঘোচাবার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হ'য়ে আসে, যখনই মনে হয়, মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করার আমার কতটুকু অধিকার আছে! যাকে দিই নি, তার কাছে প্রয়োজনে দাবী করি কোন্ মুখে? কিছুকাল পূর্ব্বে 'নারীর মূল্য' বলে' আমি একটা প্রবন্ধ লিখি। সেই সময় মনে হয়, আচ্ছা, আমার

দেশের অবস্থা ত আমি জানি, কিন্তু আরও ত ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম সেখানে কি দিয়েছে? পুঁথি পত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা' দেখে' একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অন্যায় এবং অবিচার সর্ব্বত্রই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে' কম বেশী প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত করে' রেখেচে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই আজ দেশ জুড়ে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। স্বার্থ এবং লোভে, পৃথিবীজোড়া যুদ্ধে পুরুষ যখন মারামারি কাটাকাটি বাঁধিয়ে দিলে তখনই তাদের প্রথম চৈতন্য হ'ল, এই রক্তারক্তিই শেষ নয়, এর উপরে আরও কিছু আছে। পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই। এই দারুণ দুর্দ্দিনে নারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তার বাধল না। আমি ভাবি, এই বঞ্চিতার দান না পেলে এ সংসার-ব্যাপী নরযজ্ঞের প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ আজ কি হ'ত? অথচ, এ কথা ভুলে' যেতেও আজ মানুষের বাধে নি।

আজ আমাদের ইংরাজ Governmentএর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, কিন্তু কেবলমাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে? এই প্রসঙ্গে আমার কন্যাদায়গ্রস্থ বাপ-খুড়া-জ্যেঠাদের ক্রোধান্ধ মুখগুলি মনে পড়ে। এবং সেই সকল মুখ থেকে যে সব বাণী নির্গত হয় তা'ও মনোরম নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে' অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যা-পণের বিরুদ্ধে মহা হৈ চৈ করে' তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধে করে' দিইনে কেন?

আমি বলি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাঁরা চোখ কপাল তুলে বলেন, সে কি ম'শায় কন্যা দায় যে।

আমি বলি, কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতীকার আপনিই করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করারও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের মুখে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে' তাকে বোষ্টম হ'তে অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেমন আমার ভরসা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচ্‌ড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাকেও দাতাকর্ণ হ'তে বলায় লাভ হ'বে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরে'ও না, তাকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতীকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়গ্রস্তই আমার কথা বোঝে না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে' বলেন,—সে কি করে' হ'বে ম'শাই, সমাজ র'য়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বলতে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে! কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুন্‌তে হয় বটে, আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না! একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে' নেয়, কেবল মেয়ে বলে', দায় বলে', ভার বলে' নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়ে মানুষকে মানুষ করার ভারও তারই উপরে এবং এখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ সব কথা আমি শুধু বলতে হয় বলে'ই বলছিনে; সভায় দাঁড়িয়ে

মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করছিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই এ কথা বলছি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন, কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছে না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হ'বার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করে'ই এত বড় বস্তু লাভ করা যা'বে না! মেয়ে মানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করে'ই রেখেছি, মানুষ হ'তে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে' দেখে'ছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে!

এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিষটা তুচ্ছও নয়, এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে' যে ছোট করে' রাখতে চেয়েছে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হ'বার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী, একে ফাঁকি দিয়ে, যে কেউ যে কোন একটা কিছুকে বড় করে' খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হ'তে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেম্‌নি অজ্ঞাতসারে ছোট করে' ফেলেছে।

এ কথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য। Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং দশের তিনি অনেক মঙ্গল করে' গেছেন, কিন্তু তাদের মানুষ হ'তে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বল্‌তে হ'য়েছে 'All my life I have been but a slave-driver!' এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় গ্লানি করে' যে গেছেন সে কেবল জগদীশ্বরই জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর পাঠক ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হ'য়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হ'য়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এম্‌নি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হ'য়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে' দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেম্‌নি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হ'বার স্বাধীনতা হরণ করেনি অথচ, তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত্‌ কেড়ে নিয়ে জোর করে' রাখতে পেরেছে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক এই আশঙ্কাই আমার বুকের উপর জাঁতার মত বসে' আছে। মনে হয়, এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকী রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি

বলেন, কিন্তু এই এসিয়ার এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা এক তিল দেয় নি, অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও এ বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পারবে না। শুধু আপাতদৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য, বিলাসী এবং হীন হ'তে স্থরু করেছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার আরম্ভ হ'য়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক সহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে' ঘুরে' বেড়িয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিষ আজও তারা হারায়নি। কেবল মাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হ'বার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে' তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখ্‌তে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত আনন্দ জিনিষটা একেবারে নির্ব্বাসিত হ'য়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হ'য়ে

আছে সত্য, কিন্তু একদিন, যেদিন তাদের ঘুম ভাঙ্‌বে, এই সমবেত নর-নারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠ্‌বে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক্, খসে' পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'বে না,—তাতে বাধা দেয় এমন শক্তিমান কেউ নেই।

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেছে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট-গৌরব, বিলুপ্ত-সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলে না, পাবার উপায় কর্‌তে হয়। এই উপায়ের পথেই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এখানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে' অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। [যার যা দাবী তাকে তা' পেতে দাও। তা সে যেখানে এবং যারই হোক্। এ আমার বই পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই দীর্ঘ জীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য।] আমি কেবল এইটুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিল সমস্যার আজও মীমাংসা করি আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হ'বে, তা সে ফল তার যা'ই হোক্। হাড়ি ডোমকে যদি মানুষ বলতে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে' আমাকে দিতেই হ'বে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌছাক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের

হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতে নেই, ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এস আমি তোমার হিতের জন্যে তোমার মুখে পরদা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে. বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশী চলা-ফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙোলেই তোমার পা ভেঙে দেব।

আমি বলি যা'র যা' দাবী সে ষোল আনা নিক্। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে। দুটো পরামর্শ দিতে পারি—কিন্তু মেরে' ধরে' হাত পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হ'বে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায়ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক, আমার মত কুড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে' কোরত ত তারাও আরামে থাকত, এদেরও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু আধটু হ'বারও জায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে, এই কথাটা আমার তোমরা ভুলোনা।

আজ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কথা বল্‌বার ছিল। সকল দিক দিয়ে কি করে সমস্ত বাঙ্গলা জীর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে,—দেশের যারা মেরুমজ্জা সেই ভদ্র গৃহস্থ পরিবার কি করে কোথায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হ'য়ে আসছে, সে আনন্দ নেই, সে প্রাণ নেই, সে ধর্ম্ম নেই, সে খাওয়া-পরা নেই; সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রামগুলা প্রায় জনশূন্য,—বিরাট প্রাসাদতুল্য আবাসে শিয়াল কুকুর বাস করে; পীড়িত নিরুপায়-মৃতকল্প লোকগুলো যারা আজও সেখানে পড়ে' আছে, খাদ্যাভাবে,

জলাভাবে কি তাদের অবস্থা,—এই সব সহস্র দুঃখের কাহিনী তোমাদের তরুণ প্রাণের সাম্‌নে হাজির করবার আমার সাধ ছিল, কিন্তু এবার আমার সময় হ'লো না। তোমরা ফিরে এস, তোমাদের অধ্যাপক যদি আমাকে ভুলে না যান ত আর একদিন তোমাদের শোনাব।*

* ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ।

শিক্ষার বিরোধ

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্ব্বিঘ্ন নিরুপদ্রব পথে চলে' আসছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে' গেছেন, তা' আমিও পড়ব। এর থেকে তিনি যখন দু'পয়সা করে' গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বস্‌তে পেয়েছেন, হ্যাণ্ডশেক করতে পেয়েছেন, তখন আমিই বা কেন না পারবো? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে' সমস্ত শিক্ষাবিধানটাই বনিয়াদ সমেত এম্‌নি টল্‌মল্ করতে লাগল যে, একদল বল্‌লেন পড়ে' যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে' দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে' আসে মুখের বিষ তত উগ্র হ'য়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই র'য়ে গেল, দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন 'জোর ধরে ত' এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না।

এম্‌নি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে’ এলেন, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে’ বসি। কিন্তু এতো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহু পূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা Anglo-Indian কাগজ একেবারে উল্লসিত হ’য়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু না হোক দেশের হিতাকাঙ্ক্ষায় এদের যখন বুক ফাট্‌তে থাকে তখনি ভয় হয়, ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে’ বাঙ্গালী পরিচালিত একখানা Anglo-Indian কাগজ। এর মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত, বিধ্বস্ত করে’ অবিশ্রাম বল্‌ছে—আমরা বলে বলে গলা ভেঙ্গে ফেলছি, ফল হয়নি,—এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে’ দিলেন। যথা—

“And if there were any among educated Bengalees, who were wavering and vacillating, knowing not what to do,—to exclude the West or to stick to the East—Rabindranath’s recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on-the-fence posture. They have jumped off on the Western side”.

অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিম প্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয়রাম' বলে' পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল! শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হ'ল! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা' নিয়ে এত বড় রই-রই করেন, যাঁদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তি-তর্কে এর কি মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভাল। কিন্তু মোটের উপর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হ'য়েছে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' অতএব তাদের সেটা বলে' দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগপন্থীর কেউ এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না। তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে' বলেছেন, "ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বম্" অতএব "মা গৃধঃ"। চমৎকার কথা,—কারও কোন দ্বন্দ্ব নেই। এ যে একটা তত্ত্ব নয় সমস্ত দুনিয়ায় এও কেউ লোকসমাজে অস্বীকার করে না, অথচ মানুষের এমন পোড়া স্বভাব যে, সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে' বলে' মিটিয়ে নেবে না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজন মত, তার মধ্যে অসংখ্য sub-clause, অগণিত qualificationএর আমদানি করে' তাকে এম্‌নি ভারাক্রান্ত করে' তুলবে যে, তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালি হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন অসঙ্কোচে তাকে সত্য বলে' চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এই জন্যই উপস্থিত factগুলোই

সংসারে সত্যের মুখোস পরে', মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে', অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে' দেয়।

কবি প্রথমেই বলেছেন,—

"এ কথা মানতেই হ'বে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হ'য়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করে'ছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল।..............অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।"

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীরভাণ্ডেই সে মুখ জুব্ড়ে আছে,—তার পেট ভরে' দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমে'ছে—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলে'ই কি এই কথা মানতেই হ'বে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হ'বে। লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে' নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকত ত' আজকের দিনে নীচে, জলের উপর এবং উর্দ্ধে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে' বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা' fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখ্লে, কিম্বা মাথায় একটা বাড়ি মেরে' সমস্ত কেড়ে' নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে' ভোজ লাগালে—এ

ঘটনা সত্য হ'লেও কোন সত্য অধিকারে বল্‌তে পারব না, কিম্বা এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হ'তে হ'বে এও স্বীকার কর্‌তে পারব না। তা' ছাড়া গাঁটকাটা কিছুতেই বলে' দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি করে' তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে' আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হ'বে পশ্চিম জয়ী হ'য়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হ'বে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবল মাত্র জয় করেছে বলে' এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, একথা কোন মতেই মেনে' নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে' নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফ্‌গানেরাও বড় কম করেনি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হ'য়েও থাকেনি। দুর্য্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হ'য়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে' বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্য্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে' মেনে' নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে' এসে সারা জীবন কেবল পাশাখেলা শিখেই কাটাতে হোতো। সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে' নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে' লুব্ধ হ'য়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফ্‌গান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান

দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফ্‌গানের কাছে শেখবার কিছুই ছিল না। আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে' আর একদিন মানুষ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেছে, সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা' শিখতে হবে না? কে বলেছে, তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে' বয়কট করতে হ'বে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়ন শাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমি বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে' কে বিবাদ করছে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর। এতকাল এই তামাসায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে' বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জনকয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে—এই ত দেখি আসলে মতভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশদ করে' দেখাবার চেষ্টা করা যাক্। পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে, দম্ভে এদের বুক ভরে' উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বা'র করেছে এবং আরও কত বা'র করত এই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন অগ্রসর হ'লে। সৌভাগ্য এবং

সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটীমাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখতে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শিখাতে পারে কিম্বা শেখবার সুযোগ দিতে পারে, অতি বড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠ্‌তে পারে, মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি? হয়েছে বৈ কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-productএর মত বলা যেতে পারে। হোক্ by-product কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত করে'ও ত আমরা মানুষ হ'তে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে, এগুলো দেখতে শুন্‌তে মানুষের মত হ'লেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলে মানুষ। বেল্‌জিয়ম্ যখন রবারের জন্য নিগ্রোদের দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত তখনও এই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে, এরা আমাদের হুকুম মান্‌তে চায় না। এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে' এদের সভ্য করবার, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি, তখন মানুষ এদের করতেই হ'বে। অতএব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। তথাস্তু বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও ইংরাজ ঠিক এই জবাবটাই দিয়ে আস্‌ছে যে, এরা অর্দ্ধ সভ্য—ছেলে মানুষ। এদের দেশে প্রচুর

অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশী খেয়ে পীড়িত হ'য়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকাকড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে' ফেলে তাই সে সমস্ত দয়া করে' আমরাই খরচ করে' দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এম্‌নি সব ভাল করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করছেন—কত কষ্ট করে' সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এদের মানুষ করতে এসেছি;—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে। কিন্তু আঃ,—গেলাম! by law established হ'য়ে এই ইণ্ডিয়ানগুলোকে মানুষ করতে করতেই হয়রান হ'য়ে মোলাম।

ভগবান্ জানেন কবে এরা আবার by law disestablished হবে! কবে আমরা মানুষ হ'য়ে এদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারব! দেড়শ বছর ধরে' তালিম দেওয়া চলছে, কিন্তু মানুষ আর হ'লাম না। কবে যে হ'তে পারব সেও ওরাই জানে আর জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু ঐ দেড়শ বছরেও যদি ওই মোহ আমাদের ঘুচে' না থাকে, যে এদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হ'য়ে উঠব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে', নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে দিতে এরা ব্যাকুল, তা' হ'লে আমি বলি আমাদের কোন কালে মানুষ না হওয়াই উচিত! ভগবান যেন কোন দিন এই দুর্ভাগাদের 'পরে প্রসন্ন না হন!

বস্তুতঃ, এ কথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হ'য়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হ'য়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু

তারই, আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এম্নি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্ব্বনাশের জন্যেই তৈরী করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকীল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মত জেলে দিতে ডেপুটি, সব্‌ডেপুটি, ধরে' আনতে থানায় ছোট বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাষ্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্ব্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, আফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ শীর্ণ কেরাণী, —তার শিক্ষা বিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন বাঁচবার বিদ্যা, কিম্বা মানুষ হ'বার বিদ্যা আছে কেবল শুক্রাচার্য্যের হাতে, আজ তার বাড়ী পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হ'তে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হ'বে, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। অমৃত-লোকের লোক হ'য়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করতে হ'য়েছিল। হ'য়েছিল সত্য কিন্তু বিদ্যা ত কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্য্যন্ত হ'তে হ'য়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদ্‌লে গেছে,—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব্ব পর্য্যন্ত হ'য়েই নাটক সমাপ্ত হ'য়ে যায়, তামাসার বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয়

শিক্ষার বিরোধ

প্রত্যেক মানব-জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিষ আছে যা' তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেম্‌নি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা' তার সাধ্যের অতীত, যা' তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে' এ কথা উড়িয়ে দেবেন না। দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে' উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই—

"মনে কর এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হ'বে। ওর মধ্যে একটী চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে' দেখে গাড়ী চলে কি করে'। অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ, সে ভক্তিভরে বাপেব পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে' ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটী মোটরের কল কারখানা পুরোপুরি শিখে' নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্দ্ধস্বরে বাঁশী বাজিয়ে দৌড় মারল। গাড়ী চালাবার সখ দিন রাত এম্‌নি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে' তার গাড়ীটা কেড়ে' নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী, ছেলেও সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হ'লেন। ভাল মানুষ ছেলেটি দেখ্‌লে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড ক'রে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্চে, তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে "মরণং ধ্রুবম্",—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বল্‌লে আমার আর কিছুতে দরকার নেই।"

স্বদেশ

এই গল্পের স্বার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারি নি। ছেলে দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে' যে বাপ প্রসন্ন হন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা' বোঝা যায় না! তবে একথা বেশ বোঝা যায়, এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে,—তা' তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন, তার "মরণং ধ্রুবম্"।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মোটর-হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাশে প্রোমোশন্ পেলে, কিন্তু যে ছেলেটির "মরণং ধ্রুবম্" সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র মন্ত্র নিয়েই পড়ে' রইল। এই তন্ত্র মন্ত্রের 'পরে কঠোর কটাক্ষ কবি পূর্ব্বেও করেছেন। তাঁর 'অচলায়তনে' এ নিয়ে হাসি তামাসা অনেক হ'য়ে গেছে, যাঁরা ওয়াকিফ্-হাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ববস্তুর পেছনে যে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তথ্য। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কূল কিনারা তার তেমনি অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে' কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে' আসছে,—আজও তার উপায় বা'র হয়নি, অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে' যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিকে অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রে এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনায় চেহারা বদলে দাঁড়ায় এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বিজ্ঞানের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

শিক্ষার বিরোধ

সে যাই হোক্, এই মোটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের-দিকে-তাকানো ভালো ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে' দিয়েছেন। যথা,—

"পূর্ব্বদেশে আমরা যে সময় রোগ হ'লে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, দৈন্য হ'লে গ্রহ-শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচ্চাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনেচি নাকি মন্ত্র-গুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য? ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই। ইউরোপের কোন কোণে-কানাচে যাদু মন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তা'হলে বলার আর কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি, সেঁকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য? ভল্‌টেয়ার বেশী দিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সে দেশে বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্ব্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে' গিয়েছিল যে ঠিক এম্‌নি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিল না যে বলে, "বাপু, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ী যাও। মারতে চাও ত অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে' নিরালায় মারণ মন্ত্র জপ করলেই কার্য্য সিদ্ধ হ'বে না?"

ইউরোপের জয় গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিম্বা যে হাতী দঁকে পড়ে' গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে' ভূতের ওঝা ও মারণ উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে! 'গোরা' বলে' বাঙ্গলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে' দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—"নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।"

কবি বলেছেন, যাদুমন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞানে। কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হ'য়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে ইউরোপ তার যাদুবিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙ্গিয়ে গেল, আর আমরা দেশ শুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড় ভেঙে সেই পাঁকেই চিরকাল পুঁতে রইলাম! বাইরের দিকে বিশ্ববস্তু যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড, অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে যাদুবিদ্যায় ভাঙে না, সংসারে যা' কিছু ঘটে তারই একটা হেতু আছে, এবং সেই হেতু কঠোর আইন কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব-জগতে কার্য্যকারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্ব্বদেশে কারও ছিল না? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হ'তে আমদানি না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশী আর কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের

প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, ত মনে হয়, লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভাল। বস্তুতঃ, এই ত নাস্তিকতা। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে-শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে—অন্ততঃ, তাদের মানুষের ধারণা যা,—তা' তারা আমাদের দেয় নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেও যে আমরা কি হ'য়ে আছি, মাত্র সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা—যা'তে নিজেদের সর্ব্ব বিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা' কিছু সমস্তের 'পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলে'ই অবনতিও আজ আমাদের এত গভীর। সেটা তো জানবার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাহিরের সাজ সজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা, অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে। তাই, একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্ব্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত হ'তে না পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই! ওদের জাতিভেদ নেই—অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হ'লেই নয়, তাদের খাওয়া দাওয়ার বাচ-বিচার নেই—সুতরাং ওটা না তুল্‌লেই আর রক্ষা নেই, তাদের মন্দির নেই—অতএব আমাদেরও গির্জ্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া করে' ধর্ম্ম-প্রচারক রাখে সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এম্‌নি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদ্‌লাবার ফন্দি তাঁরা খুঁজে পাননি, নইলে আজ তাঁদের চেনাও যেত না! অথচ, আমি এর দোষ গুণের বিচার করচিনে, আমি সরল চিত্তে বল্‌ছি, কোন দল

বা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল এর mentalityটাই আপনাদের গোচর করবার প্রয়াস করচি। [এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ, এ শুধু সম্ভবপর হ'য়েছিল তাদের অন্দরের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে'।] তাই এদের সংসর্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে, এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটেনি যে, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কেবল সেইটুকুর হুবহু নকল করলেই, তাঁরাও অম্‌নি মানুষ হ'য়ে ওদের অন্তরের পংক্তিভোজনে সরাসর বসে' যেতে পারবেন। সংসারে যা' কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না। তাই একথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধেনি যে, মানুষ হ'বার সত্যকার সজীব মন্ত্রটী কেবল ওদের এই নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটীতেই চাপা দেওয়া আছে, কোন মতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলেছে,—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ্য, অত বড় বড় বাড়ী কি হ'বে? কি হ'বে টানা পাখায়? কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে,—দূর করে' দাও মোটা মাইনের বিলিতী প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হ'য়ে গেল,—এমনি আরও কত শত। এর

কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্ব্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন্‌খানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটাকতক সাজ গোজ বদ্‌লালেই হ'বে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের পরিবর্ত্তে তালপাখা এনে, কিম্বা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দিশী অধ্যাপক আমদানি করে' কিম্বা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেক্‌চারের আইন করলেই দুঃখ দূর হ'বে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যা'তে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হ'তে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হ'বে না! হ'লেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হ'বে,—তা'তে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোন দিন মনুষ্যত্ব দেবে না।

আমার এসব কথার কথা নয়,—উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী লেক্‌চার নয়,—সত্য সত্যই যা' আমি সত্য বলে' বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বল্‌ছি। মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে, যা' কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষে অর্জ্জন করতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজী ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে, এবং এই mentalityরই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং রেলগাড়ীতে সাহেবি পোষাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায় না।

এবং এই জিনিষটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র যে, এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই ছদ্মবেশের হীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লাঞ্ছনা আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এ কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তা'ও বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে' কেউ কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য, তবে জাপান আজ এমন হ'লো কিসের জোরে? তার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! ভেবে আমি দেখেছি। পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হ'য়ে থাকে, তবে বড়ত্বটাও মেপে দেখেছি আমরা শুক্রাচার্য্যেরই মাপ কাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি শেষ মানদণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু'শো পাঁচশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে। তার কি ছিল এবং কি হ'য়েছে এ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্মসমর্পণের সূচনাই করে' থাকে, ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশী কারণ নেই। এবং এমনি দুর্দ্দিন যদি কখনো ভারতের ভাগ্যে ঘটে,—সে তার বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিস্মৃত হ'য়ে ঠিক অতখানি উন্নত হ'য়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন প্রভেদই না থাকে, ত ভারতের ভাগ্য-বিধাতা উপরে বসে' সে দিন হাসবেন কি নিজের চুল ছিঁড়বেন বলা কঠিন।

শিক্ষার বিরোধ

কোন বড় জিনিষই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না—হ'বার যো-ই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, তা' তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে' নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়েই অর্জ্জন করি—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী যদি না সে দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হ'য়ে ওঠে, এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে' এসে থাকে। এই ফুল সমেত বৃক্ষশাখা, তা' সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামীই হোক্, একদিন শুখোবেই শুখোবে, কোন কৌশলই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-মজিয়েই হোক্ বা কেড়ে-বিক্‌ড়েই হোক্, নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে' ওঠে। তার অতিরিক্ত যা' সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জ্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধ হ'য়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে' থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেছে, ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুর্‌চে, ঐ যে সহরের আলোর মালার আদি অন্ত নেই, ঐ যে শত সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড়-জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেচি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোন দিন ওর

আমদানির মূল শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হ'বে না। ও সকল আমরা সৃষ্টি করিনি, কর্‌তেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা। আজ ও সকল আমাদের না হ'লেও নয়, অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে' ওঠেনি। এই যে দেখা দেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পারি, ছাড়তেও না পারি তা' হ'লে দুষ্ট-ক্ষুধার মত ও কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি করেচে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও সকল চাই-ই চাই। ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক-গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌চে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি কিন্তু বাণিজ্য জাহাজই বল, আর মোটর গাড়ীই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের জিনিষের মধ্যে দিয়ে জন্ম লাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে' এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে' আনি, সে আমাদের সত্যকারের ঐশ্বর্য্য নয়। তাই ম্যান্‌চেষ্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাস্‌গো লিনেন এবং মসলিন, স্কট্‌ল্যাণ্ডের পশমী শীতবস্ত্র,—তা' সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক এবং দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক, কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জ্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে’ গেছি। আমি বল্‌ছিলাম যে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষে বড় জোর সেইটুকুই তৈরী করতে পারে, কিন্তু তার বেশী সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না,—এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হ’য়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হ’তে দেয় না, অতীতের গৌরব কাহিনী মুছে দিয়ে আত্মসম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে, কাণের কাছে কেবলি শোনাতে থাকে আমাদের পিতা পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ-জ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এ দুর্দ্দশা, তা’ হ’লে সে শিক্ষায় যত মজাই থাক্‌, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার শত কোটী মন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশে তার মুখের গ্রাস অপহরণ করবার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচে,—কিন্তু ঠিক ঐ সকল আমাদের দেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কি না আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন, এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয় কোন একটি সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু তো বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে, সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হ'তেও পারে। কিন্তু যে লোক শুধু মারণ উচ্চাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে সুরু করেছে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা শয়তানী নির্ণয় করা কঠিন। কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন,—

"ঐ কথাটাই ত আমরা বার বার বলচি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড় হাঁ করেচে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিশেষ মত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ এ কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে' Culture জিনিষটারও জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, ত সে কেবল এই জন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে, তা' হ'লে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হ'তেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কি ভাবে সমন্বয় হ'তে পারে আমি জানিনে। যাদের গেল্‌বার মত বড় হাঁ আছে তারা গিল্‌বেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের এত বড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ান চল্‌ছে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে তা'তে আশ্চর্য্য

হ'বার আছে কি ? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দুপক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। এবং ফের যদি আবশ্যক হয় তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হ'বে।

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে' থাকে, 'ভারতের বাণী কই ?' তা' হ'লে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করছে! এবং এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে' ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ বাঘের কাণে 'বিষ্ণু-মন্ত্র' ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কি না আমি ভেবে পাইনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়া। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা ওদের ধনবিজ্ঞান,—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেম্‌নি ধনহীন করে' তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না! সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হ'তেই চায় ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখলে দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হ'য়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই

তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর 'পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত civilizationএর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহু যুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্য্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এম্‌নি সতর্ক, এম্‌নি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে' রেখে'ছে যে কোনদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায় নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কোহিনূর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্য্যন্ত, যেখানে যা' কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ থাম্‌কা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের inquiry করে' থাকে ত আনন্দ কোরব কি হুঁসিয়ার হ'ব—চিন্তার কথা।

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক্ তারা নেবে না, কারণ তা'তে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না—কথাটা শুন্‌তে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকিটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জ্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি ত মারণমন্ত্র যত সত্যই হোক্ তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

শিক্ষার বিরোধ

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ কোরব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হোল না,—কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দু'টো আলাদা জিনিষ। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জ্জন করা নয়। এমনও হ'তে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হ'লেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দু'টো পদার্থও একেবারে উল্টো, তবু তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল।*

* ১৩২৮ সালে 'গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে' পঠিত।

স্মৃতিকথা

মনে হয়, পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীয়ের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না।

আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এত বড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।

তাঁহার আয়ুষ্কাল যে দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরাও জানিতাম, তিনি নিজেও জানিতেন।

সেদিন পাটনায় যাইবার পূর্ব্বে আমায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শয্যাগত; আমি কাছে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবার final শরৎ বাবু।

বলিলাম, আপনি যে স্বরাজ চোখে দেখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন ?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তার আর সময় হইল না।

তিনি যখন জেলে, তখন জন কয়েক লোক প্রাচীরের গায়ে নমস্কার করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার যো নাই, আমরা তাই

জেলের পাঁচীলে তাঁকে প্রণাম করিতেছি। একথা তিনি শুনিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, এরা আপনাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? দুই চোখ তাঁহার ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন। মিনিট ২০ পরে ডাক্তার দাসগুপ্ত ঘরের কোণ হইতে আমার মোটা লাঠিটা আনিয়া আমার হাতে দিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, ইঙ্গিতটা বুঝেছেন শরৎ বাবু? এরা আমাদের একটুখানি গল্প করতেও দিতে চায় না।

এ গল্পের আর আমাদের অবসর মিলিল না।

লোক বলিতেছে, এত বড় দাতা, এতবড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়, ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য? বাস্তবিক, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মধ্যেও এত বড় বৈরাগী আর আমি দেখি নাই। ঐশ্বর্য্যে যাহার প্রয়োজন ছিল না, ধন সম্পদের মূল্য যে কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে টাকাকড়ি দুই হাতে ছড়াইয়া ফেলিবে না ত ফেলিবে কে? একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, লোক ভাবে, আমি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়িয়া ঝোঁকের মাথায় প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িয়াছি। তাহারা জানে না যে, এ আমার বহুদিনের একান্ত বাসনা, শুধু ত্যাগের ছল করিয়াই ত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখিব, কিন্তু এ যখন ভগবানের ইচ্ছা নহে, তখন এই আমার ভাল।

কিন্তু এই বিরাট ত্যাগের নিভৃত অন্তরালে আর একজন আছেন —তিনি বাসন্তী দেবী। একদিন ঊর্ম্মিলা দেবী আমাকে বলিয়াছিলেন, দাদার এত বড় কাজের মধ্যে আর একজনের হাত নিঃশব্দে কাজ

করে ; সে আমাদের বৌ। নইলে দাদা কতখানি কি কর্‌তে পার্‌তেন, আমার ভারি সন্দেহ হয়। বাস্তবিক, নন-কো-অপারেশনের প্রথম হইতে ত অনেকই দেখিলাম, কিন্তু সমস্ত কিছুর অগোচরে এমন আড়ম্বরহীন শান্ত দৃঢ়তা, এমন ধৈর্য্য, এমন সদাপ্রসন্ন স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আর আমার চোখে পড়ে নাই। একান্ত পীড়িত স্বামীকে সে দিন শেষবারের মত কাউন্সিল ঘরে তিনিই পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তারদের ডাকিয়া বলিলেন, গাড়ী হউক, ষ্ট্রেচার হউক, যা হউক একটা তোমরা বন্দোবস্ত করিয়া দাও। উনি যখন মন স্থির করিয়াছেন, তখন পৃথিবীতে কোন শক্তি নাই ওঁকে আট্‌কায়। হাঁটিয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তার ফলে তোমরা রাস্তার মাঝখানেই ওঁকে হারাইবে।

অথচ নিজে সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, পথের দিকে চাহিয়া সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। ইংরেজীতে যাহাকে বলে scene creat করা, এই ছিল তাঁহার সব চেয়ে বড় ভয়। সর্ব্বলোকের চক্ষু তাঁহাতে আকৃষ্ট হওয়ার কল্পনামাত্রেই তিনি সঙ্কুচিত হইয়া উঠেন। আজ এইটিই হইতেছে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। গৃহে গৃহে যত দিন না এমনই সাধ্বী, এমনই লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করিবে, ততদিন দেশের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

আজ চিত্তরঞ্জনের দীপ্তিতে বাঙ্গালার আকাশ ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দীপের যে অংশটা শিখা হইয়া লোকের চোখে পড়ে, তাহার জ্বলার ব্যাপারে কেবল সেইটুকুই তাহার সমস্ত ইতিহাস নহে। তাই মনে হয়, সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনকে রিক্ত করিয়া লইতেও ভগবান্ যেমন দ্বিধা করেন নাই, যখন দিয়াছিলেন, তখন কৃপণতাও তেমনই করেন নাই।

অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর মিটিং উপলক্ষ্যে কোথাও দূর পাল্লায় যাইবার প্রয়োজন হইলেই আমার কেমন দুর্ভাগ্য, ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই আমার কিছু না কিছু একটা মস্ত অসুখ করিত। সেবার দিল্লী যাইবার আগের দিন দেশবন্ধু আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, কাল আপনার সঙ্গে উর্ম্মিলা যাবেন।

আমি বলিলাম, যে আজ্ঞা, তাই হ'বে।

দেশবন্ধু কহিলেন, হ'বে ত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে গাড়ী, কাল বিকাল নাগাদ আপনার অসুখ করবে ব'লে মনে হচ্ছে না ত?

আমি বলিলাম, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষীয়রা আপনার কাছে আমার দুর্নাম রটনা করেছে।

তিনি কহিলেন, তা' করেছে বটে, কিন্তু আপনি বিছানায় শোন, এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণও ত কই নেই!

আমার সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল। সে বেচারা বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াও চাকুরী পায় নাই। বড়বাবুর কাছে আবেদন করায় তিনি রাগিয়া বলিয়াছিলেন, যাকে চাকরী দিয়েছি, তার ক্যোয়ালি-ফিকেসন বেশী, সে বি, এ ফেল্।

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, আজ্ঞে, এক্‌জামিন দিলে কি আমি তার মত ফেল্ কর্‌তেও পার্‌তাম না!

আমিও দেশবন্ধুকে বলিলাম, আমার যোগ্যতা অল্প, তারা আমাকে নিন্দা করে জানি, কিন্তু আমার শু'য়ে থাক্‌বার যোগ্যতাও নেই, এ অপবাদ আমি কিছুতেই নিঃশব্দে মেনে নিতে পারব না।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, না, আপনি রাগ করবেন না, আপনার সে যোগ্যতা তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে।

গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিক মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক্ আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গলাদেশে ইংরাজী বাঙ্গলা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তবগান সুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি, তাহার আর তুলনা নাই। এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সংসারে কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাইতে পারে না? দেশবন্ধু একটুখানি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা' হ'লে কি আর রক্ষা ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মাঝে অহর্নিশি জ্বল্‌ছে, সে ত এক মুহূর্ত্তে আমাকে ভস্মসাৎ করে' দিত।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা, তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম, গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য কর্‌তে যদি এতটাই বিমুখ হ'য়ে উঠে ত তবে থাক্।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুন্ন হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ কর্‌তে জানিনে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তে

পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝ্‌বে, তার যথাসর্ব্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে! এই সকল কথা বলিতে গেলেই উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাঙ্গলাদেশ ও এই বাঙ্গলাদেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন, কি বিশ্বাসই করিতেন! কিছুতেই যেন আর তাহাদের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন না।

এ কথার আর উত্তর কি, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, বাস্তবিক এতখানি ভাল না বাসিলে এই অপরিসীম শক্তিই বা তিনি পাইতেন কোথায়? লোক কাঁদিতেছে,—মহতের জন্য দেশের লোক ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে, সে আমি চিনি। কিন্তু এ সে নয়। একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার-জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ সেই। আর আমরা, যাহারা তাঁহার আশে পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারনাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায় রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে! যেখানে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাসের আর সীমা ছিল না। যেন একেবারে অন্ধ। ইহার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সহস্র প্রমাণ প্রয়োগেও এ বিশ্বাস টলাইবার যো ছিল না।

স্বদেশ

সে দিন বরিশালের পথে, ষ্টীমারে, ঘরের মধ্যে আলো নিবানো, আমি মনে করিয়াছিলাম, পাশের বিছানায় দেশবন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, অনেক রাত্রিতে হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, শরৎবাবু, ঘুমিয়েছেন ?

বলিলাম, না।

তবে চলুন, ডেকে গিয়ে বসিগে।

বলিলাম, ভয়ানক পোকার উৎপাত।

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বিছানায় শু'য়ে ছট্‌ফট্‌ করার চেয়ে সে ঢের সুসহ। চলুন।

দুই জনে ডেকে আসিয়া বসিলাম। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তারা দেখা যায়, নদীর অসংখ্য বাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে, তাহার দূর-প্রসারী সার্চ্চলাইটের আলো কখনও বা তীরেবাঁধা ক্ষুদ্র নৌকার ছাতে, কখনও বা তরুশিরে, কখনও বা জেলেদের কুটীরের চূড়ায় গিয়া পড়িতেছে। দেশবন্ধু বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, শরৎবাবু, নদী-মাতৃক কথাটার সত্যকার অর্থ যে কি, এ দেশে যারা না জন্মায়, তারা জানেই না। এ আমাদের চাই-ই চাই।

এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পরে তিনি একা কত কথাই না বলিয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। উত্তরের প্রয়োজন ছিল না ; কারণ, সে সকল প্রশ্ন নহে, একটা ভাব। তাঁহার কবিচিত্ত কি হেতু জানিনা, উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি চরকা বিশ্বাস করেন ?

বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন, সে বিশ্বাস করিনে।

কেন করেন না?

বোধ হয় অনেকদিন অনেক চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের পাঁচ কোটিও যদি সুতো কাটে ত ষাট কোটি টাকার সুতো হ'তে পারে।

বলিলাম, পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে' একটা বাড়ী তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হ'তে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস করেন?

দেশবন্ধু বলিলেন, এ দু'টো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি,—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু, তবুও আমি, বিশ্বাস করি। আমার ভারি ইচ্ছে হয় যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোন রকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম, ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন।

দেশবন্ধু হাসিলেন; বলিলেন, আপনি হিন্দু-মুস্‌লিম ইউনিটি বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

দেশবন্ধু বলিলেন, আপনার মুসলমানপ্রীতি অতি প্রসিদ্ধ।

ভাবিলাম, মানুষের কোন সাধু ইচ্ছাই গোপন থাকিবার যো নাই, খ্যাতি এতবড় কানে আসিয়াও পৌঁছিয়াছে! কিন্তু নিজের প্রশংসা শুনিলে চিরদিনই আমার লজ্জা করে, তাই সবিনয়ে বদন নত করিলাম।

দেশবন্ধু কহিলেন, কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বল্‌তে পারেন? এরই মধ্যে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে, আর দশ বছর পরে কি হ'বে বলুন ত?

বলিলাম, এটা যদিও ঠিক মুসলমানপ্রীতির নিদর্শন নয়, অর্থাৎ, বছর দশেক পরের কথা কল্পনা করে' আপনার মুখ যেমন শাদা হ'য়ে উঠেচে, তাতে আমার নিজের সঙ্গে আপনার খুব বেশি তফাৎ মনে হচ্চে না। তা' সে যাই হোক, কেবল মাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিষ নয়। তা' হ'লে চার কোটি ইংরাজ দেড়শ' কোটি লোকের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে এদের একটা মর্য্যাদার স্থান নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়ে এদের মানুষ করে' তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর, সামাজিক অবিচার চলে' আস্‌ছে, তার প্রতিবিধান করুন, ও দিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হ'বে না।

নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লাঞ্ছনার কথায় তাঁহার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকিত। কে নাকি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিল, দেশবন্ধু শব্দের আর একটা অর্থ চণ্ডাল। এই কথায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজে উচ্চকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, উচ্চজাতির দেওয়া বিনা দোষে এই অপমানের গ্লানি নিপীড়িতদের সহিত সমভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিত। ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনারা দয়া করে' আমাকে এই 'পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে' দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিগে। আমি ঢের কাজ কর্‌তে পারবো। এই বলিয়া তিনি

ইহাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুসমাজ কত অত্যাচার করিতেছে, তাহাই এক একটা করিয়া বলিতে লাগিলেন। কহিলেন, বেচারাদের ধোপা-নাপিত নেই, ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয়না। অথচ এরাই মুসলমান, খৃষ্টান হ'য়ে গেলে আবার তারাই এসে এদের কাজ করে। অর্থাৎ হিন্দুরাই প্রকারান্তরে বল্‌ছে, হিন্দুর চেয়ে মুসলমান, খৃষ্টানই বড়। এরকম senseless সমাজ মর্‌বে না ত মর্‌বে কে? এই বলিয়া বহুক্ষণ স্থির থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি আমাদের অহিংস-অসহযোগ বিশ্বাস করেন ত?

বলিলাম, না। অহিংস সহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দেখ্‌ছি, কোথাও লেশমাত্র মতভেদ নেই।

আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, একদিন কিন্তু যথার্থই লেশমাত্র মতভেদ থাক্‌বে না, আমি এই আশাতেই আছি। ইতি মধ্যে যতটুকু শক্তি, আপনার কাজ করে' দিই। আর শুধু মত নিয়েই বা হ'বে কি, বসন্ত মজুমদার, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এঁরা ত দেশের বড় কর্ম্মী, কিন্তু ইংরাজের প্রতি বসন্তর বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষুর অহিংস দৃষ্টিপাত এবং শ্রীশের প্রেমসিক্ত বিদ্বেষবিহীন মেঘগর্জ্জন,—এই দু'টি বস্তু দেখ্‌লে এবং শুন্‌লে আপনারও সন্দেহ থাক্‌বে না যে, মহাত্মাজীর পরে অহিংস অসহযোগ যদি কোথাও স্থিতি লাভ করে' থাকে, ত এই দু'টি বন্ধুর চিত্তে। অথচ, এত বেশী কাজই বা কয় জনে করেছে? অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকথা ত গণসাধারণ, অর্থাৎ massএর জন্য? কিন্তু এই mass পদার্থটির প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নেই। একদিনের উত্তেজনায়

এরা হঠাৎ কিছু একটা করে' ফেল্‌তেও পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সে বার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ক্ষমা চেয়ে ফিরেও এসেছিল। যারা আসেনি, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা। তাই আমার সমস্ত আবেদন নিবেদন এদের কাছে। ত্যাগের দ্বারা কেউ কোন দিন যদি দেশ স্বাধীন কর্‌তে পারে, ত শুধু এরাই পার্‌বে।

এইখানে দেশবন্ধুর বোধ করি, একটা গোপন ব্যথা ছিল, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু জেলের কথায় তাঁহার আর একটা প্রকাণ্ড ক্ষোভের কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, এ দুরাশা আমার কোনদিন নেই যে, দেশ একেবারে এক লাফে পূরো স্বাধীন হ'য়ে যাবে। কিন্তু আমি চাই স্বরাজের একটা সত্যকার ভিত্তি স্থাপন কর্‌তে। আমি তখন জেলের মধ্যে, বাইরে বড়লাট প্রভৃতি এঁরা, ওদিকে সবরমতি আশ্রমে মহাত্মাজী,—তাঁর কিছুতেই মত হ'ল না, অতবড় সুযোগ আমাদের নষ্ট হ'য়ে গেল। আমি বাইরে থাক্‌লে কোন মতেই এতবড় ভুল কর্‌তে দিতাম না। অদৃষ্ট! তাঁর লীলা!

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, শু'তে যাবেন না? চলুন।

চলুন, বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই রেভোলিউসনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে

একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা' ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যা'বে না, তখন আরও স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠ্‌বে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎবাবু।

কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রিশেষের আলো-অন্ধকার আকাশের নীচে, নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।

বহুদিন পরে আর একদিন রাত্রিতে তাঁহার মুখ হইতে এমনই অকপট সত্য উক্তি বাহির হইতে আমি শুনিয়াছি। তখন রাত্রি বোধ হয় আটটা বাজিয়া গিয়াছে, আচার্য্য রায় মহাশয়কে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দেশবন্ধু সিঁড়ির উপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলাম, একটা কথা বোল্‌ব, রাগ কর্‌বেন না?

তিনি বলিলেন, না।

আমি বলিলাম, বাঙ্গলাদেশে আপনারা এই যে কয়জন সত্যকার বড়লোক আছেন, তা' পরস্পরের সন্দর্শনমাত্রই আপনারা পুলকে যে রকম রোমাঞ্চিত-কলেবর হ'য়ে ওঠেন—

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বেরালের মত?

বলিলাম, পাপমুখে ও আর আমি ব্যক্ত কোর্‌ব কি ক'রে। কিন্তু কিছু একটা না হ'লে—

দেশবন্ধুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কত যে ক্ষতি হয়, সে আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে? কেউ যদি এর পথ করে' দিতে পারে, ত আমি সকলের নীচে, সকলের তাঁবে কাজ করতে রাজি আছি। কিন্তু ফাঁকি চল্‌বে না, শরৎবাবু।

সে দিন তাঁহার মুখের উপর অকৃত্রিম উদ্বেগের যে লেখা পড়িয়াছিলাম, সে আর ভুলিবার নহে। বাহির হইতে যাহারা তাঁহাকে যশের কাঙাল বলিয়া প্রচার করে, তাহারা না জানিয়া কত বড় অপরাধই না করে! আর ফাঁকি? বাস্তবিক যে লোক তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াছে, বিনিময়ে সে ফাঁকি সহিবে কি করিয়া?

আর একটা কথা বলিবার আছে। কথাটা অপ্রীতিকর। সতর্কতা ও অতি-বিজ্ঞতার দিক দিয়া একবার ভাবিয়াছিলাম বলিয়া কাজ নাই, কিন্তু পরে মনে হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা ও সত্যের জন্য বলাই ভাল। এবার ফরিদপুরে 'কন্‌ফারেন্সে' আমি যাই নাই, তথাকার সমস্ত খুঁটিনাটি আমি জানি না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া অনেকে আমার কাছে এমন সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে,—যাহা প্রিয় নহে, সাধু ও নহে। অধিকাংশই ক্ষোভের ব্যপার এবং দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তাহা একেবারেই অসত্য।

দেশের মধ্যে রেভোলিউসনারী ও গুপ্তসমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতে-ছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলি স্বরূপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও

তাঁহার পক্ষে তেমনই অসম্ভব ছিল। তাঁহাদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাঙ্গলায় একটা appeal লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম, "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেও না পারো, ত অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থ চিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু আমার 'যদি' কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি'তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে' 'assuming but not admitting' করে' এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি, তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হ'বে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।

বলা বাহুল্য, আমি রাজি হইতে পারি নাই এবং আবেদনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাকে বলিয়াছিলেন, এ সকল যারা করে, তারা জেনে শুনেই করে, কিন্তু যারা করে না কিছুই, গভর্ণমেণ্টের হাতে তারাই বেশী করে দুঃখ পায়। সুভাষ, অনিলবরণ, সত্যেন্ প্রভৃতির জন্য তাঁহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। সুভাষকে করপোরেশনে কাজ দিবার পরে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,

I have sacrificed my best man for this corporation. এবং সেই সুভাষকেই যখন পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে সর্ব্বদিক দিয়া অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার হাত পা কাটিয়া তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া আনিতেছে।

তাঁহার ফরিদপুর অভিভাষণের পরে মডারেটদলের লোক উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, আর ত কোনও প্রভেদ নাই, আইস, এখন কোলাকুলি করিয়া মিলিয়া যাই। ইংরাজী খবরওয়ালার দল তাঁহার "জেস্‌চারের" অর্থ এবং অনর্থ করিয়া গালি দিল কি সুখ্যাতি করিল, ঠিক বুঝাই গেল না। তাঁহার নিজের দলের বহুলোক মুখ ভারি করিয়াই রহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলিবার আছে।

অসাধারণ কর্ম্মীদের এই একটা বড় দোষ যে, তাঁহারা নিজেদের ভিন্ন অপরের কর্ম্মশক্তির প্রতি আস্থা রাখিতে পারেন না। এবার পীড়ায় যখন শয্যাগত, পরলোকের ডাক বোধ হয় যখন তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, শরৎবাবু, compromise কর্‌তে যে শিখ্‌লে না, বোধ হয় এ জীবনে সে কিছুই শিখ্‌লে না। Tory Government is the cruellest Government in the world এরা না পারে, পৃথিবীতে এমন অনাচার নেই। আবার মিটমাট করে' নেবার পক্ষেও, বোধ করি, এমন বন্ধু আর নেই। কিন্তু ভয় হয়, আমি তখন আর থাকব না। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

সাহিত্য

ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য

আমি বক্তা নই। কিছু বল্‌তে আমি আদপেই পারিনে। ঘরে বসে' কাগজ কলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, আর বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার বই পড়ে' সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন থেকে লেখা আমি একমত ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্য-সেবাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে' মনে করতে' পারচিনে। আমার নিজের কথা ছাড়াও, সমস্ত দেশের সাহিত্যে কত অসত্য, কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে। সমাজের সঙ্গে মিলে' মিশে' এক হ'য়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিষ দেবার যো নেই। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের Church আছে, Navy আছে, Army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক্ যাবার যো নেই, ওদিক্ যাবার যো নেই, কোনদিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হ'য়ে যাবে! তারই মধ্যে যে একটু আধটু পারে সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

সাহিত্যে স্বাধীনতার মানে অরাজকতা, anarchy নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে' কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। 'সিডিশন' (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবেনা।

রাজনীতিতে, ধর্ম্মে, সামাজিক আচার ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাঁধা, পা গুটানো আর থাক্‌বে না, যে দিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখ্‌তে পারা যাবে, সেই দিন আবার সাহিত্য-সৃষ্টির দিন ফিরে' আসবে।

* ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

শিষ্য। প্রভু, আত্মা কি? ঈশ্বরই বা কি, এবং কি করিয়াই বা তাহা জানা যায়?

গুরু। বৎস, এ বড় কঠিন প্রশ্ন। সকলে জানে না, কিন্তু আমি জানি। বিস্তর সাধনায় তবেই তাঁকে পাওয়া যায়, যেমন আমি পাইয়াছি। অবধান কর, আমার মুখ হইতে শুনিলেই তুমি জলের মত বুঝিতে পারিবে। (শিষ্যের হাঁ করিয়া থাকা)

গুরু। (গম্ভীর হইয়া) বৎস, শাস্ত্র বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ কিনা তিনি—রস। এই রসের দ্বারাই তিনি এক এবং বহু। এই বহুকে পূত রসের দ্বারা উদ্বোধন করিয়া, একের মধ্যে বহু ও ঐক্যের মধ্যে অনৈক্যকে উপলব্ধি করিবে। ভারতবর্ষের ইহাই চিরন্তন সাধনা। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার কি হইবে, না, ভূমানন্দ লাভ হইবে—যেমন আমার হইয়াছে। তখন সেই ভূমানন্দকে, একের দ্বারা, বহুর দ্বারা, ঐক্যের দ্বারা এবং অনৈক্যের দ্বারা, ত্যাগের ভিতর দিয়া পাইলেই তোমার ত্যাগানন্দ লাভ হইবে। বৎস, সেই ত্যাগানন্দের চিত্রকে বিচিত্র করিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তোমার ঈশ্বর পাওয়া হইল। এ বোঝা আর শক্ত কি বৎস?

শিষ্য। আজ্ঞা,—আজ্ঞা না। তেমন শক্ত নয়। আচ্ছা গুরুদেব, ভূমানন্দই বা কি, আর ত্যাগানন্দই বা কি?

গুরু। বুঝাইয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরব্রহ্মই ভূমা। তাঁর আনন্দের নামই ভূমানন্দ। এ আনন্দের তুলনা নাই, কিন্তু বড় কঠোর সাধনার আবশ্যক। ভূমা অন্ত-বিশিষ্ট অনন্ত, আকার-বিশিষ্ট নিরাকার—অর্থাৎ নিরাকার কিন্তু সাকার, যেমন কালো কিন্তু সাদা,—বুঝিলে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ—যেমন কালো কিন্তু সাদা।

গুরু। ঠিক তাই। চোখ বুজিয়া অনুভব করিয়া লও, যেন কালো কিন্তু সাদা। এই যে, এই যে তাঁর পূর্ণরূপ। এই যে তাঁর সত্যরূপ, এই সত্যরূপকে হৃদয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া, একাগ্র চিত্তে বিশ্ববাণীর পবিত্র অর্ঘ্য দিয়া শতদল পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে। বৎস, এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিও না—সাধনা করিলেই পারিবে।

শিষ্য। আজ্ঞা!

গুরু। হাঁ, না হইলে আমিই বা ভূমানন্দে এমন বিভোর হইয়া থাকিতে পারিতাম কি করিয়া? আচ্ছা, এখন সেই সৎ-স্বরূপকেই শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় একীভূত করিয়া, সত্যের দ্বারা আবাহন করিয়া লইলেই তোমার হৃদয়ে বিশ্বমানবতার যে বিপুল স্পন্দন জাগ্রত হইয়া উঠিবে, সেই অনুভূতির নামই ভূমানন্দ বৎস।

শিষ্য। বুঝিয়াছি গুরুদেব, এমন কঠিন বস্তু আপনি কত সহজে এবং কি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন! ভূমানন্দ সম্বন্ধে আর আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

গুরু। (মৃদু মৃদু হাস্য। তদনন্তর চক্ষু বুজিয়া) বৎস, সমস্তই ভগবৎ প্রসাদাৎ। নিজে বুঝিয়াছি, তাঁহার সত্যরূপ এই হৃদয়ে

সম্যক অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছি বলিয়াই এত শীঘ্র তোমাকে এমন জলের মত বুঝাইয়া দিলাম। এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, অবহিত হও। কি প্রশ্ন করিয়াছিলে? ত্যাগানন্দ কি? এটিও আনন্দ-স্বরূপ বৎস। পাইলেই আমাদের আনন্দ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সেই পাওয়া যেমন-তেমন করিয়া পাইলেই ত চলিবে না। সে পাওয়া নিষ্ফল পাওয়া, সে পাওয়া পাওয়াই নয়,—অতএব ত্যাগের দ্বারা পাইবার চেষ্টা করিবে।

শিষ্য। প্রভু, ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ত্যাগের দ্বারা কি করিয়া পাইব? ত্যাগ করিলেইত হাত ছাড়া হইয়া যাইবে।

গুরু। বৎস, ভুল বুঝিতেছ। তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, ত্যাগের দ্বারা পাইতে বলিতেছি। অর্থাৎ পাঁচ জনে ত্যাগ করিতে থাকিলে সম্ভবতঃ তোমার যে প্রাপ্তি ঘটিবে, সেই যে ত্যাগের পাওয়া, সেই যে বড় দুঃখের পাওয়া, তাহাকে বিশ্বপতির দান বলিয়া হৃদয়ে সাত্বিকভাবে বরণ করিয়া লইলেই তোমার ত্যাগানন্দ জন্মিবে। আহা, সে কি আনন্দ রে! (ক্ষণকাল মুদিত চক্ষে মৌন থাকিয়া পুনরায়) বৎস, আমার এই যে 'আমি'টা,—শাস্ত্র যাকে 'অহং' বলে', 'অহমিকা' বলে', ত্যাগ করতঃ পরিবর্জ্জন করিতে আদেশ দিয়াছেন, আমার সেই 'আমি'টার মত সর্ব্বনেশে বস্তু সংসারে নাই। এই 'আমি'টাকে পাঁচ জনের মধ্যে, বিশ্বমানবের মধ্যে ডুবাইয়া দিবে। তখন, তোমার আর আত্ম-পর ভেদ থাকিবে না, পাঁচ জনকে আর আলাদা করিয়া দেখিবে না। তখন, তাহাদের

দানকেই নিজের দান বলিয়া উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে, বৎস, ভগবানের সেই আনন্দরূপকে অন্তরে ধারণ করিয়া আমি চিরদিনের মত ধন্য হইয়া গিয়াছি। আহা!

শিষ্য। বুঝিলাম গুরুদেব। এইবার আশীর্ব্বাদ করুণ, বর দিন, যেন, কঠোর সাধনার দ্বারা আপনার শিষ্য হইবার যোগ্য হইতে পারি।

গুরু। তথাস্তু।*

*যমুনা, ১৩২০ ফাল্গুন ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

সাহিত্য ও নীতি

শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণনগর নামটি আমার কাছে পরিচিত, এবং সে পরিচয় ঘটেছিল আমার পিতামহীর মুখের নানা বিচিত্র গল্প ও ছড়ার মধ্য দিয়ে। সাহিত্য-রসের সেই মধুর আস্বাদ এই প্রাচীন বয়সেও আমি ভুলি নাই। এই জনপদই যে একদিন শিল্প-কলা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল, আমি নিশ্চয় জানি, এ কথা বল্‌লে অতিশয়োক্তির অপরাধ হয় না। বাঙ্গলার মস্ত বড় দু'জন কবি,—একজনের কর্ম্মভূমি, ও অন্য জনের জন্মভূমি এই কৃষ্ণনগর! বঙ্গদেশের নানা সুখ-দুঃখের ইতিহাসে এই প্রাচীন নগর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে' আছে। ইহাকে চোখে দেখবার লোভ মনে মনে আমার চিরদিন ছিল। আজ সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর আহ্বানে সে সাধ আমার পূর্ণ হ'লো। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সাহিত্য সেবাই আমার পেশা, কিন্তু ইহার যাচাই-বাছাই ঘষা-মাজার ব্যাপারে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ, একথা আমার মুখে অদ্ভুত শুনালেও ইহা বাস্তবিক সত্য। কোন্ ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় করে' সাহিত্য-পদ নিষ্পন্ন হয়েছে, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, রস বস্তুটি কি, কাকে বলে সত্যকার আর্ট, কাকে বলে মিথ্যাকার আর্ট, কি ইহার সংজ্ঞা, আমি কিছুই এ সকলের জানি না। সুদূর প্রবাসে কেরাণীগিরী করতাম, ঘটনাচক্রে বছর দশেক হ'লো এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হ'য়ে পড়েছি। খান কয়েক বই লিখেছি, কারও ভাল লেগেছে, অনেকেরই

লাগেনি,—পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে' সপ্রমাণ করেছেন যে, বাঙ্গলা ভাষার আমি একেবারে সর্ব্বনাশ করে' দিয়েছি। এত সত্বর এত বড় দুষ্কার্য্য কি করে' কোরলাম তা'ও আমি বিদিত নই, কি-ইবা এর কৈফিয়ৎ সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সুতরাং তথ্যপূর্ণ গভীর গবেষণার লেশমাত্রও আমার কাছে আপনারা আশা করবেন না।

বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া আমার স্বভাব নয়, আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মত শক্তি বা উদ্যম কোনটাই আমার নেই, আমি শুধু আমার স্বল্পপরিসর সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির গোটাকয়েক সাদা মাটা কথাই আপনাদের কাছে বল্‌তে পারি। হয়ত বলার একটু প্রয়োজনও আছে। জবাবদিহির স্বরূপে নয়, কারণ পূর্ব্বেই বলেছি এ আমি করিনে, করার আবশ্যকতাও মনে করিনে,—এ কেবল একজন আধুনিক সাহিত্য-সেবকের নিতান্তই নিজের কথাটাই বল্‌তে চাই। পরলোকের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু ইহলোকের মানবের জীবন-যাত্রা পথের যতদূরে দৃষ্টি চলে, দেখা যায়, বিশ্ব-মানব একটা বস্তু লক্ষ্য করে' নিরন্তর চলেছে—তার তিনটে অংশ—art, morality এবং ধর্ম্ম,—religion. সংসারের সমস্ত মারামারি কাটাকাটি, একের রাজ্য অপরের কেড়ে নেওয়া, একজনের দুঃখের উপার্জ্জন অন্যজনের ঠকিয়ে নেওয়া,—সর্ব্ববিধ কাম ক্রোধ লোভ মোহ—এরা পথের জঞ্জাল, চলার কাঁটা,—কিন্তু মানবের যে বৃহত্তর প্রাণ তার লক্ষ্য শুধু ওইখানে। মাড়বারি তার কাপড়ের দোকানে বসে' একথা শুন্‌লে হাস্‌বে, বার্ড কোম্পানির বড় সাহেব তার অফিসের টেবিলে এ সত্য উপলব্ধি কর্‌তে পারবে না, stock-exchangeএর ভিড়ের মধ্যে এ কথা

একেবারে মিথ্যে বলে' মনে হ'বে, তবুও আমি জানি তাদেরও শেষগতি ওইখানে এবং এর চেয়ে বড় সত্যও আর নেই। কিসের জন্যে এত লোভ, এত মোহ? কিসের জন্যে এই বাদ-বিসম্বাদ? কিসের জন্যে এমন ঐশ্বর্য্যের কামনা? সত্যকার যা' ঐশ্বর্য্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। মানুষ একাকী তাকে অর্জ্জন করে, সঞ্চয় করে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে ঐশ্বর্য্য হ'য়ে দাঁড়ায় সেই মুহূর্ত্তেই সে তার একমাত্র আপন ভোগের বাইরে গিয়ে পড়ে। ঐশ্বর্য্যকে একাকী ভোগ করবার চেষ্টা করলেই সে আপনাকে আপনি ব্যর্থ করে' দেয়। যা' সর্ব্বমানবের। একার লোভ সেখানে পরাভূত হ'বেই হ'বে। আর এই ঐশ্বর্য্যের চরম পরিণতি কোথায়? সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায়,—art, morality এবং ধর্ম্মে। এ একলার নয়, এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বমানবের জেনে এবং না জেনে, মানুষের চেষ্টা মানুষের উদ্যম এই ঐশ্বর্য্য আহরণের দিকেই অবিশ্রাম চলেছে,—অতএব, যা অসুন্দর, যা' immoral, যা' অকল্যাণ, কিছুতেই তা' art নয়, ধর্ম্ম নয়। Art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তা' হ'লে কিছুতেই তা' immoral এবং অকল্যাণকর হ'তে পারে না; এবং অকল্যাণকর এবং immoral হ'লে art for art's sake কথাটাও কিছুতে সত্য নয়; শত সহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে' বল্‌লেও সত্য নয়। মানব জাতির মধ্যে যে বড় প্রাণটা আছে সে একে কোন মতেই গ্রহণ করে না। সুতরাং, সত্যকার কবি বলে', যথার্থ artist বলে' যাকে এক হাতে গ্রহণ করব তার সৃষ্টিকে অন্যায় বলে', কুৎসিত বলে' অন্য হাতে বর্জ্জন করা হ'তেই পারে না। বরঞ্চ চালাবার চেষ্টা করলেই সবচেয়ে বড় ভুল এবং বড় অন্যায়ই করা হয়।

কিন্তু এ ত গেল theoryর দিক্ দিয়ে, আদর্শ-বাদের দিক্ দিয়ে। এর মধ্যে হয়ত তত বিবাদ নেই। কিন্তু কবির মধ্যে, artistএর মধ্যে, অর্থাৎ তার নিজের মধ্যেই যেখানে একটা ছোট মানুষ থাকে হাঙ্গামা বাধে তাকে নিয়ে। এখানে লোভ, মোহ, যশঃ নিন্দে, prejudice, সংস্কার মাঝে মাঝে এমন কুহেলিকা গড়ে' তোলে যে, তার অন্ধকার আশ্রয়েই অনেক fraud, অনেক উৎপাত ঢুকে' গিয়ে দারুণ উপদ্রবের ভিত্তিস্থাপন করে। এই খানেই হ'ল অসত্য এবং অকল্যাণের দ্বার। এই আঁধারে অধিকারী এবং অনধিকারী, কবি এবং অকবি, সুন্দর ও কুৎসিত, কাব্য এবং নোঙ্‌রামিতে মিলে' যে মন্থন সুরু করে' দেয়, তার কাদাই ছিট্‌কে উঠে' নির্ব্বিচারে সকলের মুখে পাঁক মাখিয়ে দেয়। এ কাদা ধুয়ে দিতে পারে শুধু কাল। এর হাতেই শুধু অনাগত ভবিষ্যতে শুদ্ধ ও স্নাত হ'য়ে সত্যবস্তু মানুষের চোখে পড়ে। এই জন্যই বোধ হয় কবির মধ্যে যে অংশটুকু তাঁর কবি, এই চরম বিচারের প্রতীক্ষা করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু যে টুকু তাঁর ছোট্ট মানুষ তারই কেবল সবুর সয় না। সে কলহ করে, বিবাদ করে, দল পাকায়, হাতনাগাদ নগদ মূল্য চুকিয়ে না নিলেই তার নয়। সাময়িক কাগজপত্রে এই স্থানটাই তার বার বার ঘুলিয়ে ওঠে।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি স্কুল-মাষ্টার নন,—তিনি কবি। বেত হাতে ছেলে মানুষ করা তাঁর পেশা নয়। এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কটুকথার বিরাম নেই। কটুকথার মালিক যাঁরা তাঁরা বোধ করি কবির উক্তির এইরূপ অর্থ করেন যে, যেহেতু তিনি বেত হাতে ছেলে মানুষ করতে সম্মত নন, গল্পচ্ছলে ভুলিয়ে বুড়ো ছেলেদের নীতিশিক্ষা দিতে চান্ না, তখন নিশ্চয়ই তাঁর ছেলে বইয়ে

দেওয়াই অভিসন্ধি। কিন্তু কাব্য—যা সত্যকার কাব্য, সে যে চির-সুন্দর, চির-কল্যাণকর, কবির অন্তরের এই কথাটা তাঁরা উপলব্ধি কর্‌তেই চান না। এবং, ওই সব ফন্দি ফিকিরের মধ্যেই যে কবি এবং কাব্য আপনাদের আপনি নিষ্ফল করে' তোলে এই সত্যটাই তাঁরা বিস্মৃত হন।

এই কথাটাই আমি গোটা দুই দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিস্ফুট করতে চাই। আমার নিজের পেশা উপন্যাস সাহিত্য, সুতরাং এই সাহিত্যের দু'একটা কথা বলা বোধ করি নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা বলে' গণ্য হ'বে না। যাঁরা আমার নমস্য আমার গুরুপদবাচ্য তাঁদের লেখা থেকে এক আধটা উদাহরণ দিলে যদি বা একটু বিরুদ্ধ মত থাকে, আশা করি আপনাদের কেহই তাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা বলে' ভুল করবেন না। আমার সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনও আছে। (গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি করে' যে এই দু'টোকে ভাগ করে' লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। (Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিষই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হ'তে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হ'বে?) দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র-সৃষ্টি কি এতই সহজ? আমাকে অনেকেই দয়া করে' বলেন, মশাই আমি এমন ঘটনা জানি যে, সে যদি আপনাকে বলি, ত আপনার চমৎকার একটা বই হ'তে পারে।

আমি বলি, তা' হ'লে আপনি নিজেই সেটা লিখুন।

তাঁরা বলেন, তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি ? ওইটে যে পারিনে !

আমি বলি, আজ না পারলেও দুদিন পরে পারতে পারেন। অমন জিনিষটে খাম্‌কা হাতছাড়া করবেন না।

এঁরা জানেন না, সংসারে অদ্ভুত কিছু একটা জানাই সাহিত্যিকের বড় উপকরণ নয়। আমি ত জানি কি করে' আমার চরিত্রগুলি গোড়ে' ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু, বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ কর্‌বার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে যে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি-পুস্তক হ'বে, কিন্তু সাহিত্য হ'বে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হ'বে না।

আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে' লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না। ভালই হ'ল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে' বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক ? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম ?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ্‌ অশ্রুপরিপূর্ণ হ'য়ে

উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে' মরেছে।

অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময়ে এ কল্পনা তাঁর ছিল না, থাকলে এমন করে' তাকে গড়তে পারতেন না। কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে, সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জ্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কবি এমন করে' নিয়োজিত করতেন না।

গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিল,—সমস্ত হৃদয়-প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায়নি তা'ও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হ'লও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে' সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল, সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে, আর তার সঙ্গে সত্য, সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ্ রাঙানিতে তার মরা চলে না।

ঠিক এই অজুহাতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার 'পল্লীসমাজের' বিধবা রমাকে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে বিদ্রূপ

করে' বলেছেন, "তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কিনা তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ।" এ ধিক্কার artএর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর সামাজিক ধিক্কার art এর রাজ্যে কতখানি মহামারী উপস্থিত করতে পারে তার আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একজন প্রবীন সাহিত্যিকের একটি ছোট গল্প আছে, তার plotটা অত্যন্ত সংক্ষেপে এইরূপ,—নায়ক একজন বড়লোক জমিদার। Hero, অতএব, হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ উচ্চ, নৈতিক বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম। কলকাতায় তাঁর একটা মস্ত বড় বাড়ী আছে; ভাড়া খাটে, দাম প্রায় লাখো টাকা। এক তারিখে বাড়ীটা মাসখানেকের জন্যে একজন ভাড়া নিলে। বাড়ীওয়ালা জমিদার ত পাশের বাড়ীতেই থাকেন, হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি ওই বাড়ীটার ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শুন্‌তে পেলেন। দিন দুই পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাড়ীটার মধ্যে ভ্রূণহত্যা হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটেরা বাড়ীভাড়া না দিয়েই পালিয়েছে। তাদের ঠিকানা জানা নেই; পাপের দণ্ড দেওয়া অসম্ভব, তাই তিনি হুকুম দিলেন, বাড়ীটা ভেঙেচুরে মাঠ করে' দাও। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে অতবড় লাখো টাকার বাড়ী ভেঙে মাঠ হ'য়ে গেল।

গল্প এইখানেই সমাপ্ত হ'ল। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন Englishএর প্রবীণ অধ্যাপক এই গল্প পাঠ করে' সাশ্রুনেত্রে বারবার

বল্‌তে লাগ্‌লেন, জীবনে এমন শিক্ষাপ্রদ সুন্দর গল্প আর পড়েন নাই এবং এমন গল্প বাঙ্গলা সাহিত্যে যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

এমন গল্প আমিও যে বেশী পড়িনি সে কথা অস্বীকার করিনে, এবং বাড়ী যখন আমারও নয়, অধ্যাপকেরও নয়, গ্রন্থকারেরও নয়, তখন যত ইচ্ছে ভেঙে চুরে মাঠ করে' দিলেও আপত্তি নেই, কিন্তু [art ও সাহিত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁর মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছে, সে শুধু তিনিই জানেন।]

ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে,—ভালকে ভাল মন্দকে মন্দ বলায় কোন artই কোন দিন আপত্তি করে না। কিন্তু দুনিয়ায় যা' কিছু সত্যই ঘটে নির্ব্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

অর্থাৎ, যা' কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেম্‌নি যা' ঘটে না, অথচ, সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘট্‌লে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

আমার অবসর অল্প, বক্তব্য বস্তুকে আমি পরিস্ফুট কর্‌তে পারিনি, এ আমি জানি, কিন্তু আধুনিক-সাহিত্য রচনায় সমাজের এক শ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের উদয় হয়েছে, বিরোধের আরম্ভ যে কোনখানে, সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাটুকু বোধ করি আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর করে' তোল্‌বার আমার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই, শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর্‌বার পথে কোথায় বাধা পেয়ে আমরা যে অন্য পথে চল্‌তে বাধ্য

হ'য়ে পড়েছে, সেই আভাসটুকু মাত্র আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম।

পরিশেষে যে গৌরব আজ আমাকে আপনারা দিলেন, তার জন্যে আর একবার অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে এই ক্ষুদ্র ও অক্ষম প্রবন্ধ আমি শেষ করলাম।*

* ১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

আমি জানি, সাহিত্য-শাখার সভাপতি হ'বার যোগ্য আমি নই, এবং আমারই মত যাঁরা প্রাচীন, আমারই মত যাঁদের মাথার চুল এবং বুদ্ধি দুই-ই পেকে সাদা হ'য়ে উঠেছে তাঁদেরও এ বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নেই। কারো মনে ব্যথা দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, তবুও যে এই পদ গ্রহণে সম্মত হয়েছিলাম, তার একটি মাত্র কারণ এই যে, নিজের অযোগ্যতা ও ভক্তিভাজনগণের মনঃপীড়া, এত বড় বড় দু'টো ব্যাপারকে ছাপিয়েও তখন বারম্বার এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল যে, এই অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয়যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সবুজ-পতাকার আহ্বান্ আমাকে মান্‌তেই হ'বে, ফল তার যা'ই কেন না হউক। আর এ প্রার্থনাও সর্ব্বান্তঃকরণে করি, আজ থেকে যাত্রা-পথ যেন তাঁদের উত্তরোত্তর সুগম এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ষোল বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন যখন প্রথম আরব্ধ হয়, আমি তখন বিদেশে। তারও বহুদিন পর পর্য্যন্তও আমি কল্পনাও করিনি যে, সাহিত্য-সেবাই একদিন আমার পেশা হ'য়ে উঠ্‌বে। প্রায় বছর দশেক পূর্ব্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ি।

বাঙ্গলার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই বছর দশেকের ঘটনাই আমি জানি। সুতরাং এ বিষয়ে বল্‌তেই যদি কিছু হয়, ত এই স্বল্প কয়টা বছরের কথাই শুধু বল্‌তে পারি।

সাহিত্য

মাস কয়েক পূর্ব্বে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয়, ত অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে' নিয়ে যেও। অভিভাষণের পরিবর্ত্তে গল্প! আমি একটু বিস্মিত হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়েছিলেন, সে ঢের ভাল।

এর অধিক আর কিছু তিনি বলেননি। এতদিন বৎসরের পর বৎসর যে সাহিত্য-সম্মিলন হ'য়ে আস্‌ছে, হয় তার অভিভাষণগুলির প্রতি তাঁর আগ্রহ নাই, না হয়, আমার যা' কাজ, সেই আমার পক্ষে ভাল, এই কথাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। একবার ভেবেছিলাম, লক্ষ্ণৌ যখন যাওয়াই হ'ল না, তখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই তাঁর আদেশ পালন করব। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারলাম না। কিন্তু আজ এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর লেখা পড়তে উঠে' আমার কেবলই মনে হচ্ছে, সেই আমার ঢের ভাল ছিল। একজন সাধারণ সাহিত্য-সেবকের পক্ষে এত বড় সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ভাল মন্দ বিচার করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

বঙ্গসাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। সেই সেই বিভাগীয় সভাপতিদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং মার্জ্জিত; তাঁদের কাছে আপনারা অনেক নব নব রহস্যের সন্ধান পাবেন, কিন্তু আমি সামান্য একজন গল্প লেখক। গল্প লেখার সম্বন্ধেই দু'একটা কথা বল্‌তে পারি, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার কতটুকুই বা মূল্য! কিন্তু সেটুকু মূল্যও আমি আপনাদের নির্ব্বিচারে দিতে বলিনে, কোন দিন বলিনি, আজও বল্‌ব না। এ শুধু আমার

নিতান্তই নিজের কথা। যে কথা সাহিত্য-সাধনার দশ বৎসর কাল আমি নিঃসংশয়, অকুণ্ঠিত চিত্তে ধরে' আছি।

এই দশ বৎসরে একটা জিনিষ আমি আনন্দ ও গর্ব্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে' এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠকসংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেম্নি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে। প্রথমটা সত্য, এবং দ্বিতীয়টা সত্য হ'লে, ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা' উপায়ই থাক, সাহিত্যিকদের কেবল কটূ কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দ মত ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবেনা। মানুষ ত গরু ঘোড়া নয়! আঘাতের ভয় তার আছে, একথা সত্য, কিন্তু অপমানবোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে, এ কথাও তেমনই সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমায়েসী বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভাল নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে' ফেলা সহস্র গুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্যেই আলোচনা নয়, এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে' আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হ'য়ে আসছে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ব বিহীন কটূক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে পারে।

সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে' রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে' তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে —ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্টএর জন্যই আর্ট, এ কথা আমি পূর্ব্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য্য আমি এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।

সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে' অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা' বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ করে' আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে চাই। বিষ্ণু-শর্ম্মার দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোন ত্রুটি হ'লে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙ্গেই তা' হুঙ্কার দিয়ে ছোটে। প্রশ্ন হয়, কি পেলাম, কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হ'ল। এই লাভালাভের দিক্‌টাতেই আমি সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংস্কার ও ভাব নিয়েই ত মানুষ; এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে! সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা

যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়া কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্‌বার। পড়বা-মাত্রই মন তাঁর তিক্ত বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্ণমেন্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হ'ল বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনে কোন সাহিত্য-সেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন কর্‌লেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত, তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল, যে জন্যই হউক্, সে দিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হ'য়ে রইল—সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হ'তে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হ'ত, এমন উদাসীন হ'য়ে যদি তাঁরা না থাক্‌তেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন সকলই তাঁদিগকে সইতে হ'ত সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সে দিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কদর্য্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হ'ত, আজ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হ'য়ে যেত। এমনই ত হয়, সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। সে জানে, আজকের

লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে; হউক সে শত বর্ষ পরে, কিন্তু সে দিনের ব্যাকুল, ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে। শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের সমালোচনা করবার জন্যও আমি দাঁড়াইনি। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেম্‌নি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রা-পথের সীমা আজও তেম্‌নই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্ত্তি তেমনই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা। শুধুই কি কেবল তার কর্ত্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মত শেষ হ'য়ে গেছে? বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হ'বে,—তার কত রকমের সুখ, কত রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা,—থামবার যো নেই, চল্‌তেই হ'বে,—শুধু কি তার নিজের চলার উপরেই কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হ'তে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হ'য়ে গেছে! যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জ্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ করে' থাক্‌বে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বল্‌তে চায়! তাদের চিন্তা, ভাব আজ অসঙ্গত, এমন কি, অন্যায় বলেও ঠেক্‌তে পারে, কিন্তু তারা না বল্‌লে বল্‌বে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত

নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে'?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হ'তে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়! বর্ত্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সম্বর্দ্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই বলে' আমরা সমাজ সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি, অবিনয় মনে করে' আপনারা অপরাধ নেবেন না। 'পল্লীসমাজ' বলে' আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে' আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে

বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হ'বে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্য-সেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হ'য়ে যেত।

আগেকার দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা' নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সব চেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিষটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হ'য়ে উঠেছে।

নেহাৎ মিথ্যে বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোট খাট কারণ থাক্‌লেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে' মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হ'য়ে মিলে' আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসন-দণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সব চেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্ত-ভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে

বিধিবদ্ধ আইন হ'য়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তাঁর ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সহিত্যিক যদি তার সাহিত্য সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলে' গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে' ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে-অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে' নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে' ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে' তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে' চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে' তোলার মত পাপ অল্পই আছে। আপাত-প্রয়োজন যাই থাক, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হ'তে একে মুক্তি দিতেই হ'বে। সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্ত্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙ্গিয়ে খাওয়া চলে না, একথা কোন মতেই ভোলা উচিত নয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙ্‌রা করে' তুলে আমার

বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতি-পুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত এক দিন থাক্‌বে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

সাহিত্যের সুশিক্ষা, নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে' এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়,—এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য্য, নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা বলে' রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, এ কথা কোন মতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হ'তে পারে; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক-সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরাজীতে Idealistic ও Realistic বলে' দু'টো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হ'য়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না। অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন ধার ঘেঁসে চল্‌বে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির

উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্ব্বের মত রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে অধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপ্‌শোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিসপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে' নিতে পারবে।

কিন্তু আর না। আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আর নিতে পারব না। কিন্তু বসবার আগে আর একটা কথা জানাবার আছে। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই বিক্রমপুর বিরাট গৌরবের অধিকারী। বিক্রমপুর পণ্ডিতের স্থান, বীরের লীলাক্ষেত্র, সজ্জনের জন্মভূমি। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্তরঞ্জন এই দেশেরই মানুষ। মুন্সীগঞ্জে যে মর্য্যাদা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, সে আমি কোনদিন বিস্মৃত হ'ব না। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।*

* ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ।

ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত

বিগত আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় লিখিত 'সঙ্গীতের সংস্কার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষে ছাপিবার জন্য পাঠান। কিন্তু লেখক কি কারণে জানেন না, তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ফেরৎ আসায় "বাধ্য হয়ে গরম গরম প্রবন্ধটি একেবারে জুড়িয়ে যাবার আগে তাকে 'বঙ্গবাণীর' উদার অঙ্কে ন্যস্ত" করেছেন। প্রবন্ধটি 'বঙ্গবাণীর' মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন "—আমি সেই প্রত্নতত্ত্ববিৎকে বেশী তারিফ করি যে একখানি তাম্রশাসন খুঁড়ে বের করেছে ও পড়েচে—কিন্তু সে কবিকেও তারিফ করি না যে নতুনের গান না গেয়ে কেবল 'নতুন কিছু করোর গান গেয়েছে।" প্রবন্ধটি কেন যে ফেরৎ আসিয়াছে বুঝা কঠিন নয়। খুব সম্ভব ভারতবর্ষের বুড়া সম্পাদক দিলীপকুমারের প্রবন্ধের প্রতিবাদে তাঁহার স্বর্গগত বন্ধু, দিলীপের পিতার প্রতি এই অহেতুক কটাক্ষ হজম করিতে পারেন নাই। এবং সেই কবি নূতন গান না গেয়ে "শুধু কেবল 'নতুন কিছু করোর' গানই গেয়েছেন"—প্রমথবাবুর এই উক্তিটিকে অসত্য জ্ঞান করে' তাঁহার প্রেরিত এই উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধটিকে ত্যাগ করে' থাকেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সে যা' হউক, না ছাপিবার কি কারণ তা' তিনিই জানেন কিন্তু দিলীপকুমারের বিরুদ্ধে অধিকাংশ বিষয়েই প্রমথবাবুর সহিত আমি যে একমত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। এমন কি ষোল আনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রমথবাবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত লইয়া চুল পাকাইয়াছেন, তথাপি দিলীপের বক্তব্যের অর্থগ্রহণ করা শক্তিতে তাঁহার কুলায় নাই। প্রমথবাবু বলিতেছেন তিনি কথার কারবারী নহেন, সুতরাং 'বিনাইয়া নানা ছাঁদে' কথা বলিতে পারিবেন না—তবে মোদ্দা কথায় গালি-গালাজ যা' করিবেন তাহাতে ঝাপ্‌সা কিছুই থাকিবে না।

প্রমথবাবুর চুল পাকিয়াছে, আমার অবার তাহা পাকিয়া ঝরিয়া গেছে! দিলীপ বলিতেছেন "আমাদের সঙ্গীতে 'একটা নূতন কিছু করার সময় এসেছে, তা আমাদের সঙ্গীত যতই বড় হোক্—কেননা প্রাণধর্ম্মের চিহ্নই গতিশীলতা।" কিন্তু বলিলে কি হইবে? দিলীপের যখন একগাছিও চুল পাকে নাই; তখন এ সকল কথা আমরা গ্রাহ্যই করিব না।

দিলীপ বলিতেছেন, "যে আসলটুকু আমরা উত্তরাধিকরে সূত্রে পেয়েছি,—তাকে হয় সুদে বাড়াও, না হয় আসলটুকু খোয়া যাবে, এই হচ্চে জ্ঞানরাজ্যের ও ভাবরাজ্যের চিরন্তন রহস্য।"

প্রমথবাবু বলিতেছেন, "এ সাধারণ সত্য আমরা সকলেই জানি।" জানিই ত।

পুনশ্চ বলিতেছেন, "কিন্তু সৃজন কাজটা এত সোজা নয় যে, যে-কেউ ইচ্ছা করলেই পারবে। এ পৃথিবী এত উর্ব্বর হ'লে.........। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় যদি পঞ্চাশ ষাট বৎসর কোন নূতন সৃষ্টি না

হ'য়ে থাকে তা'হলে সেটা এতবড় দীর্ঘকাল নয় যে, আমাদের অধীর হ'য়ে উঠ্‌তে হ'বে।"

আমারও ইহাই অভিমত। আমাদের চুল পাকিয়াছে, দিলীপের পাকে নাই। আমরা উভয়ে সমস্বরে বলিতেছি, অধীর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করা অন্যায়। পৃথিবী অত উর্ব্বর নয়। পঞ্চাশ যাট বছরের বেশী হয় নাই যে, ইহারই মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিবে! আর যতই কেন কর না, কিছুই হইবে না সে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি,—ইহাতে ঝাপ্‌সা কিছুই নাই।

কিন্তু ইহার পরেই যে প্রমথবাবু বলিতেছেন, "যখন কোন স্রষ্টা সৃষ্টির প্রতিভা নিয়ে আসবে, তখন সে সৃষ্টি করবেই, শৃঙ্খল ভাঙ্‌বেই, অচলায়তন ভূমিসাৎ করবেই—তাকে কেউ ঠেকিয়ে, কেউ দাবিয়ে রাখ্‌তে পারবে না……" প্রমথবাবুর এ উক্তি আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কারণ সংসারে কয়টা লোকে আমার নাম জানিয়াছে? কয়টা লোক আমাকে স্বীকার করিতেছে? ও পাড়ার মনু দত্ত যে মনু দত্ত, সে পর্য্যন্ত আমাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে! পৃথিবীতে অবিচার বলিয়া কথাটা তবে আছে কেন? যাক্‌, এ আমার ব্যক্তিগত কথা। নিজের সুখ্যাতি নিজের মুখে করিতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি।

কিন্তু ইহার পরেই প্রমথবাবু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় উচ্চ-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রমথবাবু বলিতেছেন, "ভারতের উচ্চ-সঙ্গীত ভাবসঙ্গত। কেবল সা রে গা মা পর্দ্দা টিপে শ্রুতি-সুখকর শব্দ-পরম্পরা উৎপন্ন করলেই সে সঙ্গীত হয় না। এক কথায় রাগ রাগিণীর ঠাট বা কাঠাম্‌ ভাবগত, পর্দ্দাগত নয়।"

আমিও ইহাই বলি, এবং আমাদের নাগ মহাশয়েরও ঠিক তাহাই অভিমত। তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধে লড়াইয়ের বাজারে অর্থশালী হইয়া একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিয়া নিরন্তর এই সত্যই প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেন, সা রে গা মা আর কিছুই নয়, সা'র পরে জোরে চেঁচাইলেই রে হয়, এবং আরও একটু চেঁচাইলে গা হয়, এবং আরও জোর করিয়া একটুখানি চেঁচাইলেই গলায় মা স্বর বাহির হয়। খুব সম্ভব, তাঁহারও মতে উচ্চ সঙ্গীত 'ভাবগত', 'পর্দ্দাগত' নয়। এবং ইহাই সপ্রমাণ করিতে হারমোনিয়মের চাবি টিপিয়া ধরিয়া নাগ মহাশয় ভাবগত হইয়া যখন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের শব্দ-পরম্পরা সৃজন করিতে থাকেন, সে এক দেখিবার শুনিবার বস্তু। শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর সঙ্গীত-তত্ত্বের সহিত তাঁহার যে এতাদৃশ মিল ছিল, আমিও এতদিন তাহা জানিতাম না। আর তখন দ্বারদেশে যে প্রকারের ভিড় জমিয়া যায় তাহাতে প্রমথবাবুর উল্লিখিত ওস্তাদজীর রেয়াজের গল্পটির সহিত এমন বর্ণে বর্ণে যে সাদৃশ্য আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রমথবাবু বলিতেছেন, "যে চালের ধ্রুপদ লুপ্তপ্রায় হয়েছ, এবং যা' লুপ্ত হয়ে গেলেও দিলীপকুমারের মতে আক্ষেপ করবার কিছুই নেই; আমার মতে সেই হচ্চে খাঁটি উঁচুদরের ধ্রুপদ। এ ধ্রুপদের নাম খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ!"

ঠিক তাহাই। আমারও মতে ইহাই খাঁটী উঁচুদরের ধ্রুপদ। এবং, মনে হইতেছে নাগ মহাশয় সম্প্রতি এই খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের চর্চ্চাতেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার জয় হউক।

বৈশাখের 'ভারতী'তে দিলীপকুমার কোন্ ওস্তাদ্‌জীকে মল্লযোদ্ধা এবং কোন্ ওস্তাদ্‌জীর গলায় বেসুরা আওয়াজ বাহির হইবার কথা

লিখিয়াছেন, আমি পড়ি নাই কিন্তু অনেকের সম্বন্ধেই যে এই দু'টি অভিযোগই সত্য, তাহা আমিও আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সত্য বলিয়া জানি। প্রমথবাবু বাঙ্গলা দেশের প্রতি প্রসন্ন নহেন। চাটুয্যে বাড়ুয্যে মশায়ের মুখের গান তাঁহার ভাল লাগেনা, কিন্তু বেশীদিনের কথা নয়, এই দেশেরই একজন চক্রবর্ত্তী মশাই ছিলেন, প্রমথবাবুর বোধ করি তাঁহাকে মনে নাই।

প্রমথবাবু লিখিতেছেন, "যে জন্য আলাপের পর ধ্রুপদ, ধ্রুপদের পর খেয়াল এবং খেয়ালের পর টপ্পা, ঠুংরির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জন্যই ওই সবের 'পর বাঙ্গলাদেশে কীর্ত্তন, বাউল ও সারি গানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই শেষোক্ত তিন রীতির সঙ্গীত আমার খাঁটি বাংলার জিনিষ হ'লেও উচ্চ সঙ্গীতের তরফ থেকে আমি তাদের বিকাশকে অভিনন্দন করতে পারি না। কেন ?"

কেন ? কেননা আমরা বল্‌চি যে "তারা অতীতের সঙ্গে যোগভ্রষ্ট !"

কেন ? কেননা আমরা বল্‌চি "তারা অনেকটা ভূঁই-ফোঁড়ের মত নিজের বিচ্ছিন্ন অহঙ্কারে ঠেলে' উঠেছে।" এমন কি একজনের পাকা চুল এবং আর একজনের ন্যাড়া মাথার অহঙ্কারের উপরেও।

কেন ? কেন না, "আজকাল এইটেই বড় মজা দেখতে পাই যে, অতীতকে তুচ্ছ করে' কেবল প্রতিভার জোরে ভবিষ্যৎ গড়্‌তে আমরা সকলেই ব্যগ্র !"

শুধু প্রতিভার জোরে ভবিষ্যৎ গড়বে ? সাধ্য কি ! আমরা পাকা চুল এবং ন্যাড়া মাথা বল্‌চি সে হ'বে না ! বাধা আমরা দেবই দেব !

"আজকাল প্রতীচ্যের অনেক বিজাতীয় সঙ্গীতের স্রোত এম্‌নি ভাবে আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে' পড়েচে যে, আমরা যখনই আমাদের

প্রাচ্য সঙ্গীতের চাল বা প্রকাশ-ভঙ্গীকে এতটুকু বিচিত্র করতে যাই তখনই তা' একটা জগাখিচুড়ি হ'য়ে ওঠে।"

কেন? কেননা আমরা বল্‌ছি, তা জগাখিচুড়ি হ'য়ে ওঠে!

কেন? কেননা আমরা বল্‌ছি,—একশবার বল্‌ছি, ও দু'টো তেল জলের মত পরস্পর বিরোধী।

আমরা পাকা চুল এবং ন্যাড়ামাথা এক সঙ্গে গলা ফাটিয়ে বল্‌ছি ও-দু'টো অগুরু, চন্দনের সঙ্গে ল্যাভেণ্ডার, ওডিকলোনের মত পরস্পর বিরোধী! উঃ! অগুরু চন্দন ও ল্যাভেণ্ডার ওডিকলোন! এত বড় যুক্তির পরে দিলীপকুমারের আর যে কি বক্তব্য থাকিতে পারে আমরা ত ভাবিয়া পাইনা।

অতঃপর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নালিশ করিতেছেন, "খাড়া পর্দ্দা হ'তে খাড়া পর্দ্দার উপরে সেইভাবে লাফিয়ে পড়া, যে ভাবে কোন বীরপুঙ্গব স্বর্ণলঙ্কার এক ছাদ হ'তে আর এক ছাদে লাফিয়ে পড়েছিলেন * * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ইহা অতিশয় ভয়ের কথা! এবং প্রমথবাবুর সহিত আমি একযোগে ঘোরতর আপত্তি করি। যেহেতু ছাদের উপরে নৃত্য স্থুরু করিলে আমরা, যাহারা নীচে সুনিদ্রায় মগ্ন, তাহাদের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। তদ্ভিন্ন অন্য আশঙ্কাও কম নয়। কারণ আমরা যদিচ ন্যাড়ামাথা, কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার প্রতি যিনি বিরূপ তিনি যদি বাঁড়ুয্যে মশায়ের পাকা চুলকে গায়ের শাদা লোম ভাবিয়া ছাদে ছাদে লম্ফ দিতে বাধ্য করেন, ত বিপদের অবধি থাকিবে না।

প্রমথবাবু কহিতেছেন, "ধ্রুপদ ও খেয়াল দুইই ভারত-সঙ্গীতের দু'টি বিচিত্র ও মৌলিক বিকাশ, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে ধ্রুপদই যে

অধিক সৌন্দর্য্যশালী, তা' নিরপেক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করবেন।"

স্বীকার করিতে বাধ্য! স্বীকার না করিলে তিনি হয় নিরপেক্ষ নহেন, না হয় সঙ্গীতজ্ঞ নহেন। হেতু? হেতু এই যে, একজন পাকাচুল এবং একজন ন্যাড়ামাথা উভয়ে সমস্বরে বলিতেছি! জোর করিয়া বলিতেছি! ইহার পরেও যে সংসারে কি যুক্তি থাকিতে পারে আমরা ত ভাবিয়া পাই না! আমরা পুনশ্চ বলিতেছি যে, "ধ্রুপদ হচ্চে সব রীতির গানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও পূজ্যতম!" দুনিয়ায় এমন অর্ব্বাচীন কে আছে যে, এতবড় অখণ্ড যুক্তির সম্মুখেও লজ্জায় অধোবদন না হয়! তবু ত শক্তিশেল হানিলাম না। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের 'মুখপাতের' যুক্তিটা চাপিয়া গেলাম!

আমাদের ওস্তাদদের সম্বন্ধে দিলীপকুমার বলিয়াছেন যে, আমরা ছাত্রদের পক্ষে মাছি-মারা নকলের পক্ষপাতী, অর্থাৎ ছাত্রদের আমরা গ্রামোফোন করিয়াই রাখিতে চাই, দিলীপকুমারের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রমথবাবু ত স্পষ্টই বলিতেছেন "আমি ত কোন দিনই আমার ছাত্রদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করিনি,—কেন না, স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অবসর না দিলে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। * * * * ইত্যাদি।"

আমার নিজের ছাত্রদের সম্বন্ধেও আমার ঠিক ইহাই অভিমত। এবং শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায় তাহা আমরা কেহই চাহিনা। (অবশ্য কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও এ কথা বোধ করি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমার নিজের ছাত্র নাই। কারণ, যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ছাত্রই আমার কাছে শিখিতে চাহে না।

লোকের মুখে-মুখে শুনিতে পাই, এমন দুর্বিনীত ছাত্রও আছে যে বলে যে, ওঁর কাছে শেখার চেয়ে বরঞ্চ প্রমথবাবুর কাছে গিয়া শিখিব।)

সে যাই হউক, কিন্তু ছাত্রদের সম্বন্ধে আমরা উভয়েই দিলীপকুমারের অভিযোগের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করি। এইরূপ হীন পন্থা আমরা কেহই অবলম্বন করিনা। উনিও না, আমিও না।

আরও একটা কথা। আমাদের ওস্তাদ্‌দের মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে দিলীপকুমার যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসার এবং অসঙ্গত। প্রমথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "মানুষ যখন কোন একটা ভাবের আবেশে মাতোয়ারা হ'য়ে ওঠে, তখন আর জ্ঞান থাকে না।" সত্যই তাই। জ্ঞান থাকেনা। আমাদের নাগ মশায় যখন খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ চর্চ্চা করেন দিলীপকুমার আসিয়া তাহা স্বচক্ষে একবার দেখিয়া যান! বাস্তবিক, থাকেনা!

কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, আর না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্যেক ছত্রটি তুলিয়া দিবার লোভ হয়, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে বলিয়াই বিরত রহিলাম। তাঁহার পক্ষি-সমাজের 'এক ঘরে' হওয়ার বিবরণটিও যেমন জ্ঞান-গর্ভ, তেম্‌নি বিস্ময়কর। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পরিশেষে প্রবন্ধ সমাপ্তও করিয়াছেন তেম্‌নি সারবান্ কথা বলিয়া—"আসল কথা, সকল বিষয়েই অধিকারী ভেদ আছে।" অর্থাৎ, গান গাহিতে জানিলেই যে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, এবং এক কাগজে না ছাপিলে আর এক কাগজে ছাপিতেই হইবে, তাহা নয়;—অধিকারী ভেদ আছে।*

* 'ভারতবর্ষ', ১৩৩১ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে গৃহীত।

আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ

শিবপুরের এই ক্ষুদ্র সমিতির সাহিত্য-শাখার পক্ষ হইতে আপনাদিগের সম্বর্দ্ধনার ভার একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াছে। আমি আপনাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেছি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটি সাহিত্যিক জমায়েত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের আয়োজন ও আয়তনের বিপুলতার কাছে এই ক্ষুদ্র অধিবেশনটি আরও ক্ষুদ্র কিন্তু আপনাদের পদার্পণে এই ক্ষুদ্র বস্তুটি আজ যে গৌরব লাভ করিবে, তাহাকে কিছুতেই যে আর ছোট বলা চলিবে না, এই লোভই আমরা কোনমতে সম্বরণ করিতে পারি নাই।

সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি; শুধু কেবল তাঁহাকে মাঝখানে পাইবার লোভেই নয়,—এই সভাপতি লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই মর্ম্ম-পীড়ার কারণ ঘটে। আমরা তাই স্থির করিয়াছিলাম যে, এমন এক ব্যক্তিকে আনিয়া হাজির করিব, যাঁহার সর্ব্বোচ্চ স্থানটি লইয়া তর্ক না থাকে,—এই আনন্দ উৎসবের মাঝখানে মর্ম্মদাহের যেন আর লেশ মাত্র অবকাশ না ঘটে।

সর্ব্ব প্রকার সভা-সমিতিতেই গতিবিধি আমার অল্প। কখনো বা খবর পাই না বলিয়া, এবং কখনো বা পারিয়া উঠি না বলিয়াই যাওয়া হয় না। অতএব সাহিত্যের নাম দিয়া দেশের মধ্যে সচরাচর যে সকল দরবার বসে, সেখানে ঠিক যে কি সব হয় আমি জানি না।

ুবে, ঘরে বসিয়া সংবাদ পত্রাদির মারফতে যে সকল তথ্য পাই তাহা ়ইতে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়াছে। আজিকার এই সমবেত াাহিত্যিকগণের সম্মুখে আমি সবিনয়ে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

বহু ধনীর সমাগমে আড়ম্বর-বহুল দেশের এই সকল সাহিত্যিক-জনতায় দরিদ্র সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হন কি না আমি নিশ্চয় জানি না। এবং হইলেও, কিছু তাঁহারা তথায় বলিবার প্রয়াস করেন কি না, তাহাও অবগত নই। হয়ত কিছু বলেন, কিন্তু সভার একান্ত হইতে নিরন্ন, নিছক-সাহিত্য-সেবীর ক্ষীণ কণ্ঠ প্রবল পক্ষের উদ্দাম কোলাহলে ।ব সম্ভব ঢাকা পড়িয়া যায়—তাঁহাদের কথা আমাদের কাণে পৌঁছে া। কিন্তু কণ্ঠ যাঁহাদের চাপা পড়ে না, কথা যাঁহাদের সাধারণের কানে ঢাকের মত পিটিতে থাকে,—গলায় তাঁহাদের জোর আছে ালিয়া আমি দ্বেষ করি না, কিংবা সাহিত্য সাধনায় বৎসরের তিন শ' চৌষট্টি দিনই সাহিত্যিকগণকে অকাতরে ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র একটি দিন যাঁহারা নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন, এইরূপ বিনীত ও উদার ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষা হওয়াও সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই একটা াাত্র দিনের উদ্যম যখন তাঁহাদের সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন দুই একটা কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এইখানে আমি একটা কথা ভাল করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই য, কোন ব্যক্তি বা সমিতিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমি একটা কথাও বলিতেছি না। কারণ, ইহা বিশেষ কোন লোক বা বিশেষ কোন সমিতির খেয়ালের ব্যাপার হইলে বলার কোন প্রয়োজনই হইত না। আমি সাধারণ ভাবেই আমার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

সাহিত্য

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাহিত্য রচনার কাজটাকে বাহুল্য মনে করিয়া যাঁহারা ইহার সমালোচনার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন, বক্তব্য তাঁহাদের প্রধানতঃ দুইটি। অন্য শাখা প্রশাখা অনেক আছে,—সে কথা পরে হইবে।

প্রথমে তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষার মত ভাষা আর কাহার আছে? আমাদের সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে; আমাদের সাহিত্য 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছে; এমন কি আমাদের সাহিত্য যে খুব ভালো, এ কথা বিলাতের সাহেবেরা পর্য্যন্ত বলিতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এত বড় উন্নতি কোন্ দেশ আর কবে করিয়াছে?

তাঁহাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্য রসাতলে গেল,—আর বাঁচে না। আবর্জ্জনায় বাঙ্গলা সাহিত্য বোঝাই হইয়া উঠিল, আমাদের কথা কেহ শুনে না; হায়! হায়! বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া নাই, মুগুর মারিবে কে? ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক নভেল ও কবিতা বাহির হইতেছে, তাহাতে সুশিক্ষা নাই—তাহা নিছক দুর্নীতিপূর্ণ। ইহার কুফলও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কারণ প্রত্নতত্ত্বের যে সকল বই এখনও লেখা হয় নাই, তাহার প্রতি পাঠকদিগের আগ্রহ দেখা যাইতেছে না, এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল বই পাঠকদিগের উৎসাহের অভাবে লেখাই হইতেছে না।

অবশ্য আমি স্বীকার করি, যে-সকল বই লেখা হয় নাই, তাহা না পড়িবার প্রায়শ্চিত্ত কি আমি জানি না, এবং পাঠকের আগ্রহের অভাবে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তিদের বই লেখা বন্ধ হইয়া আছে, ইহারই যে কি উপায় আছে তাহাও আমার গোচর নয়, কিন্তু

আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ

ঝুড়ি ঝুড়ি বই লেখা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবারও আছে এবং বোধ হয় বলিবার সামান্য দাবীও আছে।

যাঁহারা এই অভিযোগ আনেন তাঁহারা কখনো কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন বাস্তবিক কয়টা বই মাসে মাসে বাহির হয়? ভাল ও মন্দে মিলাইয়া আজ পর্য্যন্ত কয়খানা নাটক, নভেল ও কবিতার বই বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা কত? বঙ্গ-সাহিত্য আমাদের বিশ্ব-সাহিত্যে জায়গা লইয়াছে জানি, কিন্তু শুধু কেবল আমরাই ত নয়, আরও ত কেহ কেহ আছেন, বিশ্ব-সাহিত্যে যাঁহারা আমাদেরই মত স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাটক নভেলের তুলনায় কয়খানা নাটক নভেল বাঙ্গলায় আছে? কবিতার বই বা কয়টা বাহির হইয়াছে? নাটক নভেলে বাঙ্গলাদেশ প্লাবিত হইয়া গেল, এ বুলি কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন আমি জানি না, কিন্তু এখন যে-কেহ দেখি আপনাকে বঙ্গ-সাহিত্যের বিচারক বলিয়া স্থির করেন, তিনিই এই বুলি নির্ব্বিচারে আবৃত্তি করিয়া যান, মনে করেন, সমজদার বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবার ইহার চেয়ে বড় পথ আর নাই। কথায় কথায় তাঁহারা বিশ্ব-সাহিত্যের উল্লেখ করেন, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সত্যকার পরিচয় যদি তাঁহাদের থাকিত, ত জানিতেন যাহাকে তাঁহারা আবর্জ্জনা বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন, সেই আবর্জ্জনাই সকল সাহিত্যের বনিয়াদ, তাহারাই সাহিত্যের অস্থি-মজ্জা। মেঘদূত, চণ্ডীদাস, গীতাঞ্জলি কোন সাহিত্যেই ঝুড়ি ঝুড়ি সৃষ্টি হয় না। এবং আবর্জ্জনা থাকে বলিয়াই ইহাদের জন্মলাভ সম্ভবপর হইয়াছে; না হইলে হইত না। আবর্জ্জনার বালাই যে দিন দূর হইবে, সে দিন যাহাকে তাঁহারা সার বস্তু বলিতেছেন, সেও সেই

পথেই অন্তর্হিত হইবে। আবর্জ্জনা, চিরজীবী হইয়া থাকে না, নিজের কাজ করিয়া সে মরে, সেই তাহার প্রয়োজন, সেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু সেই আবর্জ্জনার ভার বহিতে যে দিন দেশ অস্বীকার করিবে সে দিন আনন্দ করিবার দিন নহে, সে দিন দেশের দুর্দ্দিন।

আর এই যে একটা কথা,—ভাল ভাল বই অর্থাৎ ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাহির হইতেছে না, কেবল কবিতা, কেবল উপন্যাস,—এ কথার উত্তর কি কথা-সাহিত্য লেখকদের দিবার? তাহারা বড় জোর এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে পারে যে, বাঙ্গলা দেশের গীতাঞ্জলি বাঙ্গলা দেশের 'ঘরে বাইরে'—অর্থাৎ কথা সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি একটা কলরব উঠিয়াছে যে, আধুনিক উপন্যাস লেখকেরা বঙ্কিম-সাহিত্যকে ডুবাইয়া দিল। বঙ্কিম-সাহিত্য ডুবিবার নয়। সুতরাং আশঙ্কা তাঁহাদের বৃথা। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই যে নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জ্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন। আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য ব্যবসায় আজও আমার বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ

বৎসর পূর্ব্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবল মাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে এক দিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্তত করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্ত্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই। কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছি, আশা করি এ কথা কাহারও মনে কল্পনায়ও উদয় হইবে না। ধরা যাক্ তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' বই। শৈবলিনীর সম্বন্ধে লেখা আছে—"এমনি করিয়া প্রেম জন্মিল।" এই 'এম্‌নি'টা হইতেছে—নক্ষত্র দেখা, নৌকার পাল গণনা করা, মালা গাঁথিয়া গাভীর শৃঙ্গে পরাইয়া দেওয়া, আরও দুই একটা কি আছে, আমার ঠিক মনে নাই। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা অতিশয় জটিল। গঙ্গায় ডুবিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবের নৌকায় চড়িয়া পরপুরুষ কামনা করিয়া স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি, সে সমস্তই নির্ভর করিয়াছে শৈবলিনীর বাল্যকালে 'এম্‌নি করিয়া' যে প্রেম জন্মিয়াছিল তাহারই উপর। তখনকার দিনে পাঠকেরা লোক ভাল ছিল। এবং বোধ করি তখনকার দিনের সাহিত্যের শৈশবে ইহার অধিক গ্রন্থকারের কাছে তাহারা চাহে নাই, এবং এই দুষ্কৃতির জন্য শেষকালে শৈবলিনীর যে সকল শাস্তি ভোগ হইয়াছিল তাহাতেই তাহারা খুসী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু

এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক, তাহারা গ্রন্থকারের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না, নিজে তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায় শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মানো সম্ভবপর কিনা এবং এত বড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কি না। প্রতাপ অতবড় একটা কাজ করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হয়ত অবলীলাক্রমে বলিয়া বসিবে—কি এমন আর সে করিয়াছে! শৈবলিনী পরস্ত্রী, গুরুপত্নী,—নিজের ঘরে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে নাই, এমন অনেকেই করে না, এবং করিলে গভীর অন্যায় করা হয়। আর তার যুদ্ধের অজুহাতে আত্মহত্যা? তাহাতে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাজ ভাল নয়। সংসারের উপরে, নিজের স্ত্রীর উপরে এই যে একটা অবিচার করা হইয়াছে, আমরা তাহা পছন্দ করি না। আর তাহার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা' আত্মহত্যায় আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের? অথচ, সেকালে আমি লোককে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে শুনিয়াছি, "তুমি প্রতাপের ন্যায় আদর্শ পুরুষ হও।" মানুষের মতি গতি কি বদলাইয়াই গেছে।

আর একটা চরিত্রের উল্লেখ করিয়া আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র। এ কথা কেন তুলিলাম হয়ত তাহা অনেকেই বুঝিবেন। সে দিনের সঙ্গে এ দিনের এই খানেই একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার জীবনের অবসান হইয়াছে পিস্তলের গুলিতে। এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি না হইলে কাণা ও খোঁড়া হইয়া তাহাকে নিশ্চয়ই কাশীর পথে পথে 'একটি পয়সা দাও' বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। তার চেয়ে এ ভালই হইয়াছে,

সে মরিয়াছে। তাহার মরার সম্বন্ধে আধুনিক লেখক ও পাঠকগণের যে আঁপত্তি আছে তাহা নয়। কিন্তু আগ্রহও নাই। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন। পাপের শাস্তি না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না, অতএব শাস্তি চাই-ই। এই 'চাই-ই'এর জন্য গ্রন্থকারকে যে অদ্ভূত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সেই খানেই আমাদের বড় বাধা। তাহার গোবিন্দলালকে ভালোবাসিবার যে শক্তি সাধারণ নারীতে তাহা অসম্ভব,—উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দলালের ভাল করিতে, 'বারুণী'র জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনিই প্রিয়তমের জন্য, আবার সেই রোহিণীই যখন কেবল মাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই অকারণে এবং এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া, আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। রোহিণী পাপিষ্ঠা, এবং যে পাপিষ্ঠার প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, তাহারও প্রতি কিন্তু এত বড় অবিচার করিতে আমাদের হাত উঠে না। সে কাল ও একালে এখানেই মস্ত বড় ব্যবধান। বিধবা রোহিণীর দুর্ভাগ্য যে, সে গোবিন্দলালকে ভালোবাসিয়াছিল। তাহার দুর্বুদ্ধি, তাহার দুর্ব্বলতা,—কিন্তু পাপের সঙ্গে এক করিয়া, ইহাদের একত্রে ছাপ মারিয়া দিবার যখন অনুরোধ আসে তখন সে অনুরোধ রক্ষা করাকেই আমরা অকল্যাণ বলিয়া মনে করি।

প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির বাটখারায় ওজন করিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে কি হয় তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। একটুখানি ব্যক্তিগত হইলেও আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। 'পল্লীসমাজ' বলিয়া একটা গ্রন্থ আছে। তাহাতে বিধবা রমা রমেশকে ভালোবাসিয়াছে দেখিয়া সেদিন একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক, 'সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা' গ্রন্থে এইরূপে রমাকে তিরস্কার করিয়াছেন—"তুমি না অত্যন্ত বুদ্ধিমতী? তুমি বুদ্ধিবলে পিতার জমিদারী শাসন করিয়া থাক, কিন্তু নিজের চিত্ত দমন করিতে পারিলে না? তুমি এতদূর সতর্ক যে রমেশের চাকরের নামে পুলিশে ডায়রী করাইয়া রাখিলে, অথচ, তুমি শিবপূজা কর, তাহার সার্থকতা কোথায়? তোমার এই পতন নিতান্তই ইচ্ছাকৃত।" এই অভিযোগের কি কোন উত্তর আছে, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক হইয়া সাহিত্যিককে মানুষে যখন এমনি করিয়া জবাবদিহি করিতে চায়?

সেই ভাল-মন্দ, সেই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন; শুধু এই উচিত-অনুচিতই রোহিণীকে গোবিন্দলালের লক্ষ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। যেখানে ভালবাসা উচিত নয়, সেখানে ভালবাসার অপরাধ যতই হউক, —বিশ্বাসহন্ত্রীর ঢের বড় অপরাধ মৃত্যুকালে হতভাগিনীর কপালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দাগিয়া দিতেই হইল। এই অসঙ্গত জবরদস্তিই আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। ভাল-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে; মন্দের ওকালতী করিতে কোন সাহিত্যিকই কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে

প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক-দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।*

* ১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে, সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্যের রীতি ও নীতি

শ্রাবণ মাসের "বিচিত্রা" পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রস-রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানতঃ আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনাদোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই চারি জন ভক্ত জুটিয়াছেন; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাওনা তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা' ছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল। তাঁর

যে-জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি-তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাচে পড়িলে আমি ত এক দণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায় পৌছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি কোনটারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব! তখন?

ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার! 'রস-সৃষ্টি' 'রসোদ্বোধন' প্রভৃতির রস-বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে না কি? এ কেবল রস-রচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়;—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

এতো গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানিনা কিন্তু অনুমান করিতে পারি।

প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা ত আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গাহস্তা শুচি-ধর্ম্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি-ধর্ম্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক আধটা টুক্‌রা টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নর-নারীর যৌন মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস্। অথচ, যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে

যে, সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না। জগতে এমন অনেক নোংরা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন মতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।

কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপ-জাম-ফুলও না, যদিচ সে, শিরীষ ফুলের সর্ব্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়! রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ, হাতের কাছে বাগ্দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল, সে তাঁহার চোখে পড়িল না! কুমুদ ফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ্ম তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিল ফুলের সহিত নাসিকার, কদলী বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই। আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিম্বফল অনেকে তরকারি রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎ-সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি বশতঃই এরূপ করে।

কিন্তু এই লইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিরর্থক! এগুলি যুক্তিও নয়, তর্কও নয়, কোন কাজেও লাগে না। অথচ, এই ধরণের গোটা কয়েক এলো-মেলো দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া কবি চিরদিনই জোর করিয়া বলেন, এর পরে আর সন্দেহ-ই থাক্‌তে পারে না যে, আমি যা বোল্‌চি তাই ঠিক এবং তুমি যা বোল্‌চ সেটা ভুল।

কিন্তু এ কথাও আমি বলি না যে, আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে দুঃখ করিবার আদৌ কারণ ঘটে নাই, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ মনোভাব একেবারেই আকস্মিক। তাঁহার হয়ত মনে নাই, কিন্তু বছর কয়েক পূর্ব্বে আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, সে দিন তাঁহার বিদ্যালয়ের একটি বারো তেরো বছরের ছাত্র 'পতিতা'র সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছে।

আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ছোড়দা হঠাৎ কবি-যশোলুব্ধ হইয়া কাব্য-কলায় মনোনিবেশ করিলেন। এবং বাঙ্গলা ভাষায় গভীর ভাব প্রকাশের যথেষ্ট সুবিধা হয় না বলিয়া ইংরাজী ভাষাতেই কবিতা রচনা করিলেন। রচনা করিলেন কি চুরি করিলেন জানি না, কিন্তু কবিতাটি আমার মনে আছে।—

A lion killed a mouse
And carried it into his house ;
Then cried his mother,
And therefore cried his sister !

ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়া কবিতাটি অনবদ্য। কিন্তু তুমুল তর্ক উঠিল, 'মাদার' কার ? সিঙ্গীর না ইঁদুরের ? বড় বৌ ঠাকরুণ ক্ষণকাল কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, না না ওদের নয়। ও কবির 'মাদার'। 'পতিতা' গল্প রচনার বিবরণ শুনিলে বৌ ঠাকরুণ হয়ত বলিবেন, এ ক্ষেত্রে কাঁদা উচিত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের। আর কাহারও নয়। এতো গেল অসাধু সাহিত্যের দিক। আবার সাধু-সাহিত্যের দিকেও তরুণ কবির অভাব নাই। এদিকে যিনিই কবিতা বা গান লেখেন, তিনিই লেখেন, তোমার বীণা আমার তারে বাজিতেছে।

পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার ঝিলিক্‌-মারা অরূপ মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইতেছি, বুকের মাঝে তোমার নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, খেয়ার ঘাটে বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কাণ্ডারি! এখন পার কর। ইত্যাদি।

একটা উদাহরণ দিই। ভাদ্র মাসের 'কেতকী' পত্রিকায় গান ছাপা হইয়াছে—

তোমার ভাঙার গানে তোমায় নেব চিনি
পরাণ পাতি শুন্‌বো পায়ের রিনি ঝিনি!
(তোমার) কাল বোশেখীর ঝড়ে তোমায় নেব দেখে
(তোমার) শ্রাবণ ধারা অঙ্গে আমার নেব মেখে।
(আমার) বুকের মাঝে তোমার আঘাত চিহ্নখানি—
আমার রোদনের মাঝে তোমার দৈববাণী!
ভুল করে' যে ভুলবো তোমায় হ'বে না তা'
(তোমার) আঘাত এলে কোথায় বা তার
লুকাবো ব্যথা?
আমার ছড়িয়ে প'ল সকল খানে—
সারা বুকে
আমার জড়িয়ে গেল সকল হিয়া
দুঃখে সুখে!
সেখায় আমি তোমায় খুঁজে নেব চিনি—
(আমার) পরাণ পাতি শুন্‌বো নূপুর রিনি ঝিনি।

উপরের উদ্ধৃত ইংরাজী কবিতাটির ন্যায় এ গানখানিও অনবদ্য, কি ঝঙ্কারে, কি ভাবের গভীরতায়, কি বৈরাগ্যের বেদনায়! 'কেতকী'র তরুণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রচয়িতার বয়স কত?

সে বন্ধু-গৌরবে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, আজ্ঞে, পোনর ষোলর বেশী নয়!

মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, দেশশুদ্ধ সাহিত্যিক বালক বালিকার দল যখন প্রহ্লাদ হইয়াই উঠিল, এবং 'ক' লিখিতে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল, তখন ওরে অতিবৃদ্ধ! এক মাথা পাকা চুল লইয়া আর বাঁচিয়া আছিস্ কিসের জন্য?

সাহিত্য সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালরও না, মন্দরও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্য গ্রন্থ তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্য-সৃষ্টি। লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাঁহার শিরে বর্ষিত হোক না। অথচ, অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হোক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্য সম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্দ্ধিত হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রস-বস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ, ও আমি জানি না। রসিক অরসিকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেও আমি অপারক। কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে, কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই! 'সোনার তরী'র যা' লইয়া চলে 'চোখের বালির' তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে, বক ফুলে 'সোনার তরী'র প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সে গুলা না হইলেই

নয়। তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।

কবি সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্র-শাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত ক'রেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বল্‌তে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্ম্মের রাজত্ব-সীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হ'য়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পিয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তি-স্বভাব-বর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হ'চ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেচে।"

কবির এই উক্তির মধ্যে বহু অভিযোগ নিহিত আছে, সুতরাং কথাগুলিকে একটুখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু Sex-Psychology, Anatomy অথবা Gynaecology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। পৃথিবী সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে, ইহা যত বড় কথাই হৌক, সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তা-ধারার ফল এই জিনিষটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক, উপন্যাসের চলে না। বিজ্ঞান

ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার। চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে ভয় কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া নোঙ্‌রামী যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাঙ্গলাদেশের একজনও অতি-আধুনিক সাহিত্য-সেবী একথা বলে না।

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মপুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা-সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। রাজার পুত্র গেলেন চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তর মাঠের দুর্গম পথ পার হইয়া রাজকন্যার সন্ধানে। কোটলপুত্রের ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধি তাঁহার নাই, সওদাগর পুত্রের বেনেবুদ্ধি তাঁহার নাই, আছে শুধু রস। গিয়া বলিলেন, তুমি যে তুমি এই আমার যথেষ্ট। এই রস উপভোগ করিবার মত রসজ্ঞ ব্যক্তির সংসারে অভাব নাই তাহা মানি, কিন্তু ভিন্ন রুচির লোকও ত সংসারে আছে? তাহারা গিয়া যদি বলে, রাজপুত্র, তোমার মনের মধ্যে রাজকন্যার রূপ-যৌবন স্থান পায় নাই, যৌতুক স্বরূপ অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রতিও তোমার কিছুমাত্র খেয়াল নাই, তুমি মহৎ,— কন্যাটি যে ঘুঁটে-কুড়োনির কন্যা নয়, রাজার কন্যা, ইহাই তোমার যথেষ্ট,—মনস্তত্ত্বের অবতারণায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজপুত্র! তোমার মনের কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া না

বলিলে ত এই উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্যের সমস্ত রসটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, তখন ইহাদেরই মুখেই বা হাত চাপা দিবে কে ?

এই ধরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সাহিত্য রচনায়। পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছি না, করিতেছি হাতের কাছে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অসম্ভব কল্পনার উদাহরণ পাইতেছি বলিয়া, বাঙ্গলা দেশে তাঁহার পাঠক সংখ্যা বিরল নয়। আমি নিজে দেখিয়াছি মুদির দোকানে একজন গ্রন্থ পাঠ করিতেছে এবং বহুলোকে গলদশ্রু-লোচনে সেই সাহিত্যসুধা পান করিতেছে। নিষ্ঠাবান্ সচ্চরিত্র দরিদ্র নায়ক মা কালীর কাছে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া সাত ঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইল। ছেলে মরিল কিন্তু ভয় নাই। শ্মশানে জটা-জূট-ধারী তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এক সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাবে ছেলের চিতার উপরে 'বাবা' বলিয়া উঠিয়া বসিল। রসজ্ঞ শ্রোতার দল কাঁদিয়া আকুল। তাহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেখানে কেহই ঠেলা দিয়া প্রশ্ন করে না, কেন ? কিসের জন্য ? তাহারা বলে, দরিদ্র নায়ক বড়লোক হইয়াছে ইহাই ঢের। মরা-ছেলে প্রাণ পাইয়াছে ইহাই আমাদের যথেষ্ট,—ইহাতেই আমাদের বোধের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা মেটে। ইহা অনির্ব্বচনীয়,—এই প্রকার সাহিত্য-রসেই আমাদের হৃদয়ের বসন্তলোকে কল্পলতায় ফুল ফুটে।

কলহ করিবার কি আছে ? কিন্তু, আমি যদি এ কাজ না পারি, নিজের গ্রন্থের দরিদ্র নায়ককে মা কালীর অনুগ্রহ জোগাড় করিয়া দিতে সক্ষম না হই, জটা-জূট-ধারী সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া না পাইয়া মরা-ছেলেকে

দাহ করিতে বাধ্য হই, ত নিশ্চয় জানি আমার বই তাহারা পুড়াইয়া ছাই করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? বরঞ্চ, হাত জোড় করিয়া চতুরাননের কাছে গিয়া বলিব, তাহারা আরও খান কয়েক বই আমার পুড়াক, সে আমার সহিবে, কিন্তু এই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মার ক্ষুধা, বোধের ক্ষুধা মিটাইবার সৌভাগ্য "শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

কিন্তু কেন? কেন, এই জন্য যে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্ম্মও এক নয়, ধর্ম্মের সীমানাও এক নয়। এবং মানুষের বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধার জাতি-ভেদ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিলে ইহাদের অর্থ-ই প্রায় থাকে না।

কবির কাঁকর-পদ্মের উদাহরণে নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহা যুক্তিও নয়, নৈয়ায়িকের দৃষ্টান্তও নয়। অতএব, ইহা রস-রচনা। আমার বোধ হয় উপাখ্যান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় দুরূহ। আমি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, কাঁকর বরণীয় কি কি পদ্ম বরণীয়, চড়াই পাখী ভালো কি মোটর গাড়ী ভালো বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কবি তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্ম্মে' নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ও ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দু'টি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার

আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক্। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হৌক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। অবশ্য ঠিক এ জিনিষটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে অনেকগুলি নজির তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন,—

"শারীর ব্যাপার মাত্রেই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা, চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে।"

কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নর-নারীর মধ্যে ইহা আছেও জানি, চলেও জানি, দোষেরও

বলিতেছি না, তবুও কেমন যেন পারিয়া উঠিনা। আমাদের সমাজে এ বস্তুটিকে লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstrationএ লজ্জা করে। খুব সম্ভব আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্ব্বলতা লইয়াই তো অনেক প্রণয়-চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুস্কিলে তো পড়ি নাই। কাব্য-সাহিত্য এক, কথা-সাহিত্য আর। 'হৃদয়-যমুনা' 'স্তন' 'বিজয়িনী' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে যাহাই ঘটুক কথা-সাহিত্যে মনে হয় আমারই মত কবি এ দৌর্ব্বল্য কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ করি এই সকল এবং এম্নি আরও দুই একটা ছোট খাটো ত্রুটির কথা লোকের মুখে শুনিয়া কবি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। "বিদেশের আমদানি" কথাটা তাঁহার ক্ষোভেরই কথা। দেশ ভেদে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হয়, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যের যে দেশ-বিদেশ নাই এ সত্য কবি জানেন। এবং সকলের চেয়ে বেশী করিয়াই জানেন। তা' না হইলে আজ বিশ্বশুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বিশ্বের কবি বলিয়া মর্য্যাদা দিত না। কবির সৃষ্টি সমুদ্রের ন্যায় অপরিসীম। নজির আছে জানি, তথাপি সেই সমুদ্র হইতেই স্ব-মতের অনুকূলে নজির তুলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া শুধু অবিনয় নয়, অন্যায়।

কবি বলিয়াছেন,—

"ভারতসাগরের ওপারে (অর্থাৎ য়ুরোপে) যদি প্রশ্ন করা যায় তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন? উত্তর পাই, হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে। ভারত-সাগরের এ পারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, হাট ত্রি-সীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী।"

এ জবাব কবিকে কে দিয়াছে জানি না, কিন্তু যে-ই দিয়া থাক্ আমি তাহার প্রশংসা করিতে পারি না।

নরেশচন্দ্র বলিতেছেন,—

"......হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়। তা' ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী-বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তা'তে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।"

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট কথা এমনি নির্ভয়ে আর কেহ বলিয়াছেন কিনা জানি না।

সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি না। 'বিদেশের আমদানী' কথাটা মুর্গী খাওয়ার অপবাদ নয় যে, শুনিবা মাত্রই লজ্জায় মাথা হেট করিতে হইবে। অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানী প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে এমন কেহই নাই যে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে। যত মত-ভেদই থাক গায়ের জোরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হয়। কিন্তু এই সকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা করিতেছে। ইহা যে প্রায় অনধিকারচর্চ্চার কোঠায় গিয়া পড়িতেছে

তাহাও সম্পূর্ণ বুঝিতেছি, কিন্তু না বলিয়াও কোন উপায় পাইতেছি না।

এ প্রবন্ধের কলেবর আর অযথা বাড়াইব না। কিন্তু উপসংহারে আরও দুই একটা সত্য কথা সোজা করিয়াই কবিকে জানাইব। তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ শ্লেষও তেম্‌নি নিষ্ঠুর! তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে, এ কথা কেহ-ই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য রাস্তার ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পারের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়ত, কখনো কোথাও কাহারও ভুল হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এত বড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে?

কবি বলিয়াছেন,—

"সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে, বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি * * *।"

এই যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিষ শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে? ইহাই কি তাঁহার আদেশ?

পরের লাইনে কবি বলিয়াছেন,—

"সে দেশের (অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের) সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দিবে?"

দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার-করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না ?

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম্মে'র জবাব দিয়াছেন নরেশচন্দ্র। হয়ত তাঁহার ধারণা অনেকের মত তিনিও একজন কবির লক্ষ্য। এ ধারণার হেতু কি আছে আমি জানি না। তাঁহার সকল বই আমি পড়ি নাই, মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই শুধু দেখিয়াছি। মতের একতা অনেক জায়গায় অনুভব করি নাই। কখনো মনে হইয়াছে নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত সুনির্দ্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও নিজের মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করি নাই। নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু, মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্য্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া পালোয়ানির মাতামাতি করিতেই তিনি বই লেখেন এমন অপবাদ আমি দিতে পারি না। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক অল্পই আছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের অবিসম্বাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্ত্তব্য ইহার সমগ্র পুস্তক পাঠ করা, কোথায় বা শ্লীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও হইতে পারে কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন, আর কেহ। কিন্তু সেই 'আর কেহর'ও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে

করি। নিজের সাহিত্যিক জীবনের কথা মনে পড়ে। এই ত সেদিনের কথা। গালি-গালাজের আর অন্ত ছিল না। অনেক লিখিয়াছি, সকলকে খুসি করিতে পারি নাই, ভুল করিয়াছিও বিস্তর। কিন্তু একটা ভুল করি নাই। স্বভাবতঃ নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক বলিয়াই হৌক, বা অক্ষমতা বশতঃই হৌক, আক্রমণের উত্তরও দিই নাই। কাহাকে আক্রমণও করি নাই। বহুকাল হইয়া গেলেও, কবির নিজের কথাও হয়ত মনে পড়িবে। সংসারে চিরদিনই কিছু কিছু লোক থাকে যাহারা সাহিত্যের এই দিকটাই পছন্দ করে। এখন বুড়া হইয়াছি, মরিবার দিন আসন্ন হইয়া উঠিল, গাল-মন্দ আর বড় খাই না। শুধু 'পথের দাবী' লিখিয়া সেদিন 'মানসী' পত্রিকার মারফতে এক রায়সাহেব সাবডেপুটির ধমক খাইয়াছি। বইয়ের মধ্যে কোথায় নাকি সোনাগাছির ইয়ারকি ছিল, অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যাই হৌক, আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্য-সেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করি। এবং যে-কয়টি দিন বাঁচিব শুধু এই কাজটুকুই নিজের হাতে রাখিব।

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি ইঁহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান স্থরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু স্থতীব্র বাক্যশেলে ইঁহাদের বিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইঁহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার নির্দ্দয় বাসনা। মতের অনৈক্য মাত্রেই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব, না আছে কল্যাণ।

আমি বল্‌ব না। কারণ এতবড় অতি-বিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস করতে আমি নিজকেও চাইনে, আপনাদেরও না। কিছু আমি করেছি। বন্ধুরা বল্‌বেন শুধু কিছু নয়, অনেক কিছু। তুমি অনেক করেছ। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যাঁরা নন, তাঁরা হয়ত একটু হেসে বল্‌বেন, অনেক নয়, তবে সামান্য কিছু করেছেন, এইটিই সত্য এবং আমরাও তাই মানি। কিন্তু তাও বলি যে, সে সামান্যের ঊর্দ্ধস্থ বুদ্বুদ, আর অধঃস্থ আবর্জ্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট যা' থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়। এ যাঁরা বলেন আমি তাঁদের প্রতিবাদ করিনে, কারণ তাঁদের কথা যে সত্য নয়, তা' কোন মতেই জোর করে' বলা চলে না। কিন্তু এর জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্ত্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হ'য়ে মিল্‌তে না পারে পথ তাকে তো ছাড়তেই হ'বে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায় সে শুধু এই জন্যেই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্য্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে' বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো যে, আমার দেশে, আমার ভাষায় এতবড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন এক দিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।

নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে এক দিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আস্‌তে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে,

দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা' আমার অপরাধ বলে' গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না এ বিচার করেও দেখিনি—শুধু সে দিন যাকে সত্য বলে' অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হয়। হঠাৎ শুনলে মনে ঘা লাগে, তথাপি এ কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব-চিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য্য বিকশিত হ'য়ে উঠে। মানবচিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে

পায় না! তার পরিবর্ত্তন আছে, বিবর্ত্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্য বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুসী হ'য়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

মনে আছে দাশু রায়ের অনুপ্রাসের ছন্দে গাঁথা দুর্গার স্তব পিতামহের কণ্ঠহারে সে কালে কত বড় রত্নই না ছিল! আজ পৌত্রের হাতে বাসি মালার মত তারা অবজ্ঞাত। অথচ এতখানি অনাদরের কথা সে দিন কে ভেবেছিল?

কিন্তু কেন এমন হয়? কার দোষে এমন ঘট্‌ল? সেই অনুপ্রাসের অলঙ্কার তো আজও তেম্‌নি গাঁথা আছে। আছে সবই, নেই শুধু তাকে গ্রহণ করবার মানুষের মন। তার আনন্দ বোধের চিত্ত আজ দূরে সরে' গেছে। দোষ দাশু রায়ের নয়, তাঁর কাব্যেরও নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে তো সে যুগধর্ম্মের।

তর্ক উঠ্‌তে পারে, শুধু দাশু রায়ের দৃষ্টান্ত দিলেই তো চলে না। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী তো আজও আছে, কালিদাসের শকুন্তলা তো আজও তেম্‌নি জীবন্ত। তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না। তার দোষ-গুণেরও শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।

সমগ্র মানব জীবনে কেন, ব্যক্তি বিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়মই বিদ্যমান। ছেলে বেলায় আমার 'ভবানী পাঠক' ও 'হরিদাসের গুপ্তকথা'ই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন কত রস, কত আনন্দই যে এই দুইখানি বই থেকে উপভোগ করেছি, তার সীমা নেই। অথচ,

আজ সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ বলা কঠিন। অথচ এমনই পরিহাস, এমনই জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য উপন্যাসের ভাল মন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের 'পরেই। কিন্তু একি বিজ্ঞান ইতিহাস? এ কি শুধু কর্ত্তব্য কার্য্য, শুধু শিল্প যে, বয়সের দীর্ঘতাই হ'বে বিচার করবার সবচেয়ে বড় দাবী?

বার্দ্ধক্যে নিজের জীবন যখন বিস্বাদ, কামনা যখন শুষ্ক-প্রায়, ক্লান্তি অবসাদে জীর্ণ দেহ যখন ভারাক্রান্ত,—নিজের জীবন যখন রসহীন, বয়সের বিচারে যৌবন কি বার বার দ্বারস্থ হ'বে গিয়ে তারই?

ছেলেরা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে যখন আমার কাছে উপস্থিত হয়—তারা ভাবে এই বুড়ো লোকটার রায় দেওয়ার অধিকারই বুঝি সবচেয়ে বেশী। তারা জানে না যে, আমার নিজের যৌবন কালের রচনারও আজ আমি আর বড় বিচারক নই।

তাদের বলি, তোমাদের সম-বয়সের ছেলেদের গিয়ে দেখাও। তারা যদি আনন্দ পায়, তাদের যদি ভালোলাগে, সেইটিই জেনো সত্য বিচার।

তারা বিশ্বাস করে না, ভাবে দায় এড়াবার জন্যই বুঝি এ কথা বল্‌চি। তখন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, বহু যুগের সংস্কার কাটিয়ে উঠাই কি সোজা? সোজা নয় জানি, তবুও বলব, রসের বিচারে এইটেই সত্য বিচার।

বিচারের দিক থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক থেকেও ঠিক এই এক বিধান! সৃষ্টির কালটাই হ'লো যৌবনকাল—কি প্রজা সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম করে'

অভিভাষণ

মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত ভীষণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেম্নি ঝাপ্সা হ'য়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে' পড়ে, তার উৎসমুখ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই,—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।

আজ আমি বৃদ্ধ, কিন্তু বুড়ো যখন হইনি, তখন পূজনীয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' অনেকের সাথে ভাষা-জননীর পদতলে যেটুকু অর্ঘ্যের যোগান দিয়েছি, তার বহুগুণ মূল্য আজ দুই হাত পূর্ণ করে' আপনারা ঢেলে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের নমস্কার করি।*

* ১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে দেশবাসী প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর।

অভিভাষণ

আবার একটা বছর গড়িয়ে গেল। জন্মদিন উপলক্ষে সে দিনও এমনই আপনাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সে দিনও এম্‌নি স্নেহ, প্রীতি ও সমিতির একান্ত শুভ কামনায় আজকের মতই হৃদয় পরিপূর্ণ করে' নিয়েছিলাম, শুধ্‌ দেশের অত্যন্ত দুর্দ্দিন স্মরণ করে' তখন আপনাদের উৎসবের বাহ্যিক আয়োজনকে সঙ্কুচিত করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। হয়ত আপনারা ক্ষুন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করেননি, সে কথা আমার মনে আছে। দুর্দ্দিন আজও অপগত হয়নি, বরঞ্চ শতগুণে বেড়েচে, এবং কবে যে তার অবসান ঘট্‌বে তাও চোখে পড়ে না, কিন্তু সেই দুর্দ্দশাকেই সব চেয়ে উচ্চস্থান দিয়ে শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতায় জীবনের অন্যান্য আহ্বান অনির্দ্দিষ্টকাল অবহেলা করতেও মন আর চায় না। আজ তাই আপনাদের আমন্ত্রণে শ্রদ্ধানত চিত্তে এসে উপস্থিত হয়েছি।

শুনেছি সমিতির প্রার্থনায় কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছেন, Libertyতে তার ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষের দিকে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সেবার অপ্রত্যাশিত পুরস্কার আছে। এ আমার সম্পদ। তাঁকে নমস্কার জানাই, এবং সমিতির হাত দিয়ে একে পেলাম বলে' আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই লেখাটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটুখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বিস্তারিত

বিবরণও নয়, দোষগুণের সমালোচনাও নয়, কিন্তু এরই মধ্যে চিন্তা করার, আলোচনা করার, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক-নির্ণয়ের পর্য্যাপ্ত উপাদান নিহিত আছে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' উল্লেখ করে' বলেছেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায়,—মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দশার বিবরণে, তার প্রতীকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ, 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে' বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এমন কথা, বোধকরি এর পূর্ব্বে আর কেউ বলতে সাহস করেনি। এবং এ কথাও হয়ত নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে এই হচ্চে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত। এই অভিমত সবাই গ্রাহ্য করতে পারবে কিনা জানিনে, কিন্তু যারা পারবে, উত্তর কালে তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল। এবং যারা পারবে না তাদেরও একান্ত শ্রদ্ধায় মনে করা ভালো যে, এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের—যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।

গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় স্বদেশের দুঃখের কাহিনী, অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী কি করে' যে লেখকের অন্যান্য রচনা ছায়াচ্ছন্ন করে' দেয় আমি নিজেও তা' জানি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি সভায় গিয়েও তা' অনুভব করে' এসেচি। বছর কয়েক পূর্ব্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্যসভায় একবার উপস্থিত হ'তে পেরেছিলাম। দেখলাম তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে' বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহুস্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন, বক্তার পরে বক্তা—সকলের

মুখেই ঐ এক কথা,—বঙ্কিম "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তি-যজ্ঞে প্রথম পুরোহিত। সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়লো একা 'আনন্দমঠে'র 'পরে। 'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণচরিতের' উল্লেখ কেউ কেউ করলেন বটে, কিন্তু কেউ নাম করলেন না 'বিষবৃক্ষে'র, কেউ স্মরণ করলেন না একবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে। ঐ দু'টো বই যেন পূর্ণ চন্দ্রের কলঙ্ক, ওর জন্যে যেন মনে মনে সবাই লজ্জিত। তারপরে প্রত্যেক সাহিত্য-সম্মিলনীর যা' অবশ্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্য-সেবীদের নির্ব্বিচারে ও প্রবলকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের স্মৃতি সভার পুণ্য কার্য্য সে দিনের মতো সমাপ্ত হলো। এমনিই হয়।

কিন্তু একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। বঙ্কিমের ন্যায় অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দু'টি যিনি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে' আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল? কারণ, এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে স্বকীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে রবীন্দ্রনাথ হয়ত কোনদিন এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। আজ সকল কথা তাঁর বুঝিনি, কিন্তু সে দিন হয়ত আমার নিজের সংশয়ের মীমাংসাও এর মধ্যেই খুঁজে পাবো।

কবি তাঁর বাল্য-জীবনের একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে তাঁর চোখের দৃষ্টি-শক্তির ক্ষীণতা। এ তিনি জান্‌তেন না। তাই, দূরের বস্তু যখন স্পষ্ট করে' দেখতে পেতেন না, তার জন্যে মনের মধ্যে কোন

অভাব বোধও ছিল না। এটা বুঝলেন চোখে চস্‌মা পরার পরে। এবং এর পরে চস্‌মা ছাড়াও আর গতি ছিল না। এমনিই হয়—এ-ই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। বাঙ্গলার শিক্ষিত মন কেন যে 'বিজয় বসন্তের' মধ্যে তার রসোপলব্ধির উপাদান আর খুঁজে' পায়না, এই তার কারণ। এবং মনে হয় আধুনিক-সাহিত্য-বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য রচনায় আর যাই কেন না হোক্‌, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি ও মার্জ্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারম্বার আঘাত করতে থাকলে বাঙ্গলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক্‌, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হ'বে তার চেয়েও অনেক বেশী। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।

বলবার হয়ত অনেক কিছু আছে, কিন্তু আজকের দিনে আমি সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হ'ব না।

শেষের একটা নিবেদন। শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

আপনারা আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।*

* ৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত।

যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

সামতাবেড়, পানিত্রাস

কল্যাণীয়েষু,— জেলা হাবড়া

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে, আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বল্‌তে পারিনে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো তারও যদি সাড়া না দিই তো শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হ'বে তাই নয়, কোন দিক থেকেই যে যতীন্‌কে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না সে দুঃখের অবধি থাক্‌বে না। অনেকেই জানে না যে, যতীনকে আমি সত্যই ভালবাসি। শুধু কেবল কবি বলে' নয়, তাঁর ভেতরে এম্‌নি একটি স্নেহ-সরস, বন্ধু-বৎসল, ভদ্র মন আছে যে, তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন্ জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বার বার করে' পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে কানে যেন কত-কি বল্‌তে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে, আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি, আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বল্‌তেই হয় তো সত্যি কথাই বলি! যতীন্‌কে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুসি করতে পারতাম না সত্যি না হ'লে। যাক্ এ কথা।

যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট ;—হ'বেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে' তার দামটি ছোট নয়। এ তো চ্যাঁটরা দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে "জয়, যতীন্ বাগচী কী জয়!" বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রস-চক্রের প্রীতি-সম্মিলন। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জন কয়েক সত্যিকার সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সেবী এক সঙ্গে মিলে' আর একজন সত্যিকার সাহিত্য-সেবককে সাদরে আহ্বান করে' এনে বলা—'কবি, আমরা তোমার সাহিত্য-সাধনায় আনন্দ লাভ করেচি, তোমার বাণী-পূজা সার্থক হয়েছে,—তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও, আমরা তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই,—তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।" এই তো ? আয়োজন সামান্য বলে' তোমরা ক্ষুণ্ণ হোয়ো না।

কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটুখানি ত্রুটি ঘট্‌লো,—আমি যেতে পারলাম না। কারণ আমি বোধ করি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অঞ্চলটায় ব্যারাম স্যারাম নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হতভাগ্য ডেঙু এসে জুটেচে। সকাল থেকে ছোট ছেলেমেয়ে দু'টীর চোক ছল্ ছল্ করচে, চাকর জন দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েছে, আমার এক নাক বন্ধ, অন্যটায় টিউব-ওয়েলের লীলা সুরু হয়েছে, রাত্রি নাগাদ বোধ হয় দেহ-মন-প্রাণ উৎসবে যোগ দিবেন আভাস ইসারায় তার খবর পৌঁছোচ্চে। নইলে এ অনুষ্ঠানে আমার নামে তোমাকে গর-হাজিরির ঢ্যারা টান্‌তে দিতাম না।

অনেকে উপস্থিত আছো, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হ'তে চল্‌লে। আগে-কার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণ না থাক্‌লেও কিছু কিছু হয়তো

মনে পড়বে, এ দিনের মত সেদিনে আমরা এমন করে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না, এক আধটা ব্যতিক্রম হয়তো ঘটেচে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্য-সেবকদের মাঝখানে ভাবের আদান প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসচে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল এ কি হ'তে চললো? নিন্দে করার এ কি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানি প্রচারের এ কি নির্দ্দয় অধ্যবসায়! কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায় দুঃখে পরিপূর্ণ হ'য়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য্য নেই, বেদনা বোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হ'তেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কতটুকু মিলচে, কার লেখা থেকে কে কতটুকু নকল করেচে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে' যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরী করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়ান্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হ'য়ে উঠেনি! যাই হোক্ কামনা করি তোমাদের রস-চক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনও প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হ'য়ে যায় আমার চিরদিনই এলো-মেলো।

তা হোক্‌গে এলো-মেলো, তবু এম্‌নি করেই বলি, তোমাদের বস-চক্রের জয় হোক, তোমাদের আজকের আয়োজন সফল হোক্‌, এবং যতীন্‌কে বোলো শরৎ দা তাঁকে এই চিঠির মারফৎ স্নেহাশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন। ইতি—৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮।

শরৎ দা।

শেষ প্রশ্ন

কল্যাণীয়াষু,—

হাঁ, 'শেষপ্রশ্ন' নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁচেছে। অন্ততঃ, যে গুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। লেখাগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে' লাল-নীল-সবুজ-বেগ্‌নী নানা রঙের পেন্সিলে দাগ দিয়ে, তাঁরা ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং পরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌঁছল কিনা। তাঁদের আগ্রহ, ক্রোধ ও সমবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে।

নিজে তুমি কাগজ পাঠাওনি বটে, কিন্তু তাই বলে' রাগও কম করোনি। সমালোচকের চরিত্র, রুচি, এমন কি পারিবারিক জীবনকেও কটাক্ষ করেছো। একবারও ভেবে দেখোনি যে শক্ত কথা বল্‌তে পারাটাই সংসারে শক্ত কাজ নয়! মানুষকে অপমান করায় নিজের মর্য্যাদাই আহত হয় সব চেয়ে বেশী। জীবনে এ যারা ভোলে তারা একটা বড় কথাই ভুলে থাকে। তা' ছাড়া এমন তো হ'তে পারে "পথের দাবী" এবং "শেষপ্রশ্ন" এর সত্যিই খুব খারাপ লেগেছে। পৃথিবীতে সব বই সকলের জন্য নয়,—সকলেরই ভাল লাগবে এবং প্রশংসা করতে হ'বে এমন তো কোন বাঁধা নিয়ম নেই। তবে, সেই কথাটা প্রকাশ করার ভঙ্গীটা ভালো হয়নি, এ আমি মানি।

ভাষা অহেতুক রূঢ় এবং হিংস্র হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু এইটেই তো রচনা রীতির বড় সাধনা। মনের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে, ভদ্র ব্যক্তির অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা চলে না, এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক দুঃখে আয়ত্ত করতে হয়। তোমার চিঠির মধ্যে এ ভুল তুমি তাঁর চেয়েও করেছো। এত বড় আত্ম-অবমাননা আর নেই।

ভাবে বোধ হয় তুমি অল্প দিনই কলেজ ছেড়েচো। লিখেচো তোমার সখীদেরও এম্‌নি মনোভাব। যদি হয় সে দুঃখের কথা। এ লেখা যদি তোমার হাতে পড়ে তাঁদের দেখিয়ো। শীলতা মেয়েদের বড় ভূষণ, এ সম্পদ কারো জন্যে, কোন কিছুর জন্যেই তোমাদের খোয়ানো চলে না।

জানতে চেয়েছো আমি এ সকলের জবাব দিইনে কেন? এর উত্তর—আমার ইচ্ছে করে না, কারণ ও আমার কাজ নয়—আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের অসম্মান করা আমার ধাতে পোষায় না। দেখো না লোকে বলে আমি পতিতাদেরও সমর্থন করি। সমর্থন আমি করিনে, শুধু অপমান করতেই মন চায় না। বলি, তারাও মানুষ, তাদেরও নালিশ জানাবার অধিকার আছে, এবং মহাকালের দরবারে এদের বিচারের দাবী একদিন তোলা রইলো। অথচ, সংস্কারের অন্ধতায় লোকে এ কথাটা কিছুতে স্বীকার করতে চায় না।

কিন্তু এ সব আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা। আর না! তবে এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বোধ হয় বলা ভালো। তোমরা হয়তো তখন ছোট, অধুনালুপ্ত একখানা মাসিক পত্রে তখন রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর ভক্তশিষ্য বলে' আমাকেও মাসের পর মাস আক্রমণ

চলছে, গালি-গালাজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবধি নেই—তার ভাষাও যেমন নিষ্ঠুর, অধ্যবসায়ও তেম্‌নি দুর্দ্দাম। কিন্তু কবি নীরব। আমি উত্ত্যক্ত হ'য়ে একদিন অভিযোগ করায় শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—উপায় কি! যে অস্ত্র নিয়ে ওরা লড়াই করে, সে অস্ত্র স্পর্শ করাও যে আমার চলে না। আর একদিন এম্‌নিই কি একটা কথার উত্তরে বলেছিলেন—যাকে সুখ্যাতি করতে পারিনে, তার নিন্দে করতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।

তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি—কিন্তু সব চেয়ে বড় এ দুটি আর ভুলিনি। আজ জীবনের পঞ্চান্ন বছর পার করে দিয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি যে আমি ঠকিনি। বরঞ্চ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভের অঙ্কে অনেক জমা পড়েছে। মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি। বস্তুতঃ এই ত কাল্‌চার,—নইলে এর কি আর কোন মানে আছে? ভাষার দখল আমার যেটুকু আছে—হয়তো একটু আছেও—তাকে কি শেষকালে এই দুর্গতির মধ্যে টেনে নামাব?

এবার তোমার সাহিত্যের সম্বন্ধে বড় প্রশ্নটার উত্তর দিই।

তুমি সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছো, "অনেকে বল্‌চেন আপনি 'শেষ প্রশ্নে' বিশেষ একটা মতবাদ প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন,—একি সত্যি?"

সত্যি কিনা আমি বল্‌বো না। কিন্তু 'প্রচার করলে, প্রচার করলে—দুয়ো দুয়ো' বলে রব তুলে দিলেই যারা লজ্জায় অধোবদন হয়, এবং না না বলে' তারস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে আমি তাদের দলে নই। অথচ উল্টে যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি এতে অত বড় অপরাধটা হ'লো কিসে, আমার বিশ্বাস বাদী-প্রতিবাদী কেউ তার সুনিশ্চিত জবাব দিতে পারবে না। তখন একপক্ষ বে-বুঝের

মতো ঘাড় বেঁকিয়ে কেবলই বল্‌তে থাকবে—ও হয় না—ও হয় না। ওতে art for art's sake নীতি জাহান্নামে যায়। আর অপর পক্ষের অবস্থাটা হ'বে আমাদের হরির মত। গল্পটা বলি। আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীর বছর চারেকের একটি ছেলের নাম হরি,—সাক্ষাৎ শয়তান। মার-ধর গালি-গালাজ, একপায়ে কোণে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—কোন উপায়েই তার মা তাকে শাসন করতে পারলে না। বাড়ীশুদ্ধ লোকে যখন এক প্রকার হার মেনেছে, তখন ফন্দিটা হঠাৎ কে যে আবিষ্কার করলে জানিনে, কিন্তু হরিবাবু একেবারে শায়েস্তা হ'য়ে গেল। শুধু বল্‌তে হোতো এবার পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে এনে ওকে অপমান করো। অপমানের ধারণা তার কি ছিল সেই জানে, কিন্তু ভয়ে যেন শীর্ণকায় হ'য়ে উঠ্‌তো। এদেরও দেখি তাই। একবার বল্‌লে হোলো—প্রচার করেছে! art for art's sake হয়নি। কিন্তু কি প্রচার করেচি, কোথায় করেচি, কি তার দোষ, কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল—এ সব প্রশ্নই অবৈধ। তখন কেউ বা দিতে লাগলো গালা-গালি, কেউবা জোড় হাতে ভগবানের আরাধনায় লেগে গেল—"রূপকার যদি সংস্কারক হয়ে ওঠেন, তবে হে ভগবান ইত্যাদি ইত্যাদি"। ওরা বোধ হয়, ভাবেন অনুপ্রাসটাই যুক্তি এবং গালিগালাজটাই সমালোচনা। তাঁদের এ কথা বলা চল্‌বে না যে, জগতের যা' চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইব্‌সেন-মেটারলিঙ্ক-টলষ্টয়ে আছে, হামস্থন-বোয়ার-ওয়েল্‌সে

আছে। কিন্তু তাতে কি? পশ্চিম থেকে বুলি আমদানি হয়েছে যে art for art's sake—এ সব যেন ওদের নখাগ্রে! গল্পের গল্পত্বই মাটি, কারণ চিত্ত-রঞ্জন হোলো না যে! কার চিত্ত-রঞ্জন? না আমার! গাঁয়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা। •

তুমি 'চিত্ত-রঞ্জন' কথাটা নিয়ে অনেক লিখেচো কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখোনি যে ওটা দু'টো শব্দ। শুধু 'রঞ্জন' নয়, 'চিত্ত' বলেও একটা বস্তু রয়েছে! ও পদার্থটা বদলায়। চিৎপুরের দপ্তরী-খানায় 'গোলেবকাওলির' স্থান আছে। ও অঞ্চলে চিত্ত-রঞ্জনের দাবী সে রাখে, কিন্তু সেই দাবীর জোরে বার্নার্ডশ'কে গাল দেবার তার অধিকার জন্মায় না। স্বীকার করি যে, বুলি আওড়ানোর মোহ আছে, ব্যবহারে আনন্দ আছে, পণ্ডিতের মতো দেখ্‌তেও হয়, কিন্তু উপলব্ধি করার জন্যে দুঃখ স্বীকার করতে হয়। অমুক for অমুক sake বল্‌লেই সকল কথার তত্ত্ব নিরূপণ করা হয় না।

নানা কারণে "পথের দাবী" রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। সে কথা জানিয়েও চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন, "এ বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্যে দিয়া যাহা বলিয়াছ দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবেনা।" সুতরাং কবি যদি একে গল্পের বই মনে করে থাকেন ত এটা গল্পের-ই বই। অন্ততঃ, এটুকু সম্মান তাঁকে দিয়ো।

উপসংহারে তোমাকে একটা কথা বলি। সমাজ সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই, বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ওকাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক, তা'ছাড়া আর কিছুই নই।

একটা মিনতি। তুমি অপরিচিতা, বয়সে হয়তো অনেক ছোট। আমি সরল মনে তোমার নানা প্রশ্নের দুই একটার জবাব যথাশক্তি দিতে চেয়েছি। তবু, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'-একস্থানে কঠিন যদি কিছু লিখে থাকি রাগ কোরোনা।*

* 'সুমন্দ ভবনে'র শ্রীমতী.........সেনকে লিখিত পত্র। বিজলী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ

কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল করে আমরা উত্তর কালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যেই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কাণে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বস্‌বার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ—আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বস্‌বে, আয়োজন-প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হ'বে না, কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তারা পাবে না। এতো সচরাচরের নয়, এ বিশেষ এক দিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভা-নায়কের কাজ আরও করবার ডাক ইতিপূর্ব্বে আমার এসেছে, আহ্বান উপেক্ষা করতে পারিনি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন করে' এসেচি, কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ ভার বহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয়-বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি আমি সেই টুকুই শুধু ব্যক্ত করব।

আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালো মন্দ বিচার, এর জাতিকুল নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষৎ আহূত হয়নি,—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে' দিতে। তাঁকে সহজভাবে বল্‌তে—কবি, তুমি অনেক দিয়েছো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল, সর্ব্ব-সিদ্ধি-দায়িনী ভাঁষা দিয়েছো তুমি, তুমি দিয়েছো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছো অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েছো জগতের কাছে বংলার ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছো যা' সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছো বড় ক'রে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। প্রজ্ঞাবান্ যাঁরা যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন, কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি সেই কথাটাই ছোট করে' জানাবো বলেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নাই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি, তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস—এবং এম্‌নি করেই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুর্গ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত কুঁড়ে, তাতে বায়ু-পিত্ত-কফ আদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চরের দল একযোগে কুপিত হ'য়ে আমাকে শয্যাশায়ী করে' দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আস্‌চি আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, যেন ও আমার হ'তে

নেই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে বল্‌চেন, উনি আসবেন না তো? এ আমরা জান্‌তাম। সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন দেখ্‌চি ভালই করেছি। এই না-আস্‌তে পারার দুঃখ আমার আমরণ ঘুচত না। কিন্তু, যা' লিখে আন্‌বার ইচ্ছে ছিল, সে হ'য়ে ওঠেনি। একটা কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অল্পস্বল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখ্‌লাম কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসেব দিতে যাওয়া বৃথা। দফাওয়ারি ফর্দ্দ মেলে না।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে ডোঙা ঠেলে, নৌকো বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাক্‌রেদী করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন গামছা-কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশযাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে, নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে' আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে' দেন। সেখানে আর একদফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর, আবার বোধোদয়-পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি, আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টা-সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাক্‌রেদী সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশযাত্রা—আবার ফিরে আসা, আবার তেম্‌নি আদর আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা। এম্‌নি বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাঙ্গলা জীবনের এক অধ্যায় শেষ হ'ল। এলাম সহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি করেছিলেন ছাত্র-বৃত্তি ক্লাসে।

তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিক সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং সসঙ্কোচে বলা চলে যে সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপর বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকীল হ'তে। এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘট্‌লো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় করে' তিনি একদিন পড়ে' শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। কে কতটা বুঝলে জানিনে কিন্তু যিনি পড়্‌ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘট্‌লো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এরপরে এ বাড়ীর উকিল হ'বার কঠোর নিয়ম সংযম আর ধাতে সইলো না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরোনো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা"। আর বেরোলো "ভবানী পাঠক"। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌-ছেলের

অ-পাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হোলো আমার বাড়ীর গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সে গুলো কারা পড়ে জানিনে। এক ইস্কুলে বেশী দিন পড়্‌লে বিদ্যে হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হোলো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর ইস্কুল বদ্‌লাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সে গুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো 'বঙ্গদর্শনের' নবপর্য্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্চে। ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সে দিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে' বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন, একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ্ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনও দিন লিখেচি; দীর্ঘকাল কাট্‌লো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে' কি করে' যে নবীন বাঙ্গলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে' উঠ্‌লো আমি তার কোনও খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তার কাছে বসে' সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু, অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে' ঘুরে' ঐ ক'খানা বই-ই বার বার করে' পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—এসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে' প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখ্‌বার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হলো না। আর কোথাও না হোক্‌, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

সাহিত্য

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে ভুল যদি থাকে তো থাক্, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হ'য়ে আছে।

জানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অবান্তর, হয়তো বা অর্থহীন, কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেছি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটা কয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন করে' দিতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যে ভাবে লাভ করেছি, তা' জানালাম। মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারক, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এ কাজ কর, কখনো ভুলো না যে, অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখতো!

কিন্তু, এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করার এটা দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হ'বে। সে যাই হোক, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।

১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত।